ল্যাং মারো ল্যাং

প্রতিভাস
কলিকাতা-৭০০০০২

ল্যাং মারো ল্যাং

আমি এক মহাপণ্ডিত। আমি সব বুঝি। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, বিদেশনীতি। আমি বলে দিতে পারি শচীনের ওই বলটা কীভাবে খেলা উচিত ছিল। সেই ভাবে মারলেই ছক্কা! এমন কী টেনিসও আমার কবজায়। বরিস শটটা রিটার্ন করে নেটের কাছে এগিয়ে এলেই পরের বলটা মিস করতো না। আর ফুটবল! ও তো সারা জীবনই খেলছি। রেগে না গেলে গোল দেওয়া যায় না। সংসারের যাবতীয় জিনিসে রেগে গিয়ে কতবার যে শট মেরেছি। সবচেয়ে মহার্ঘ শট মেরেছিলুম জীবনে একবারই। চায়ের জল ফুটতে দেরি হচ্ছিল বলে জনতা স্টোভে মারাদোনার স্টাইলে এক লাথি। পরেই দমকল এসে লালকার্ড দেখিয়ে আমাকে আর গোলকিপার আমার স্ত্রীকে সোজা হাসপাতালে। দৃশ্যটা এখনও আমার মনে পড়ে। স্টোভ গিয়ে পড়লো দেয়ালে। সেখান থেকে ছিটকে আমাদের ঘাড়ে। মুখ খুলে, তেল ছিটকে, উল্টে পাল্টে, অগ্নিকাণ্ড। সেই আগুনে পতির কোলে সতী। বারে বারে একই কথা বলছি, আর পুড়ছি। শীতকাল, তাই প্রথম তাপটাকে মনে হচ্ছিল, জড়াজড়ি করে রোদে বসে আছি। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো, সতীর চিতায় পতি। তখন বলতে লাগলুম,

'ও গো, আমরা যেন দুজনেই যাই। আমি গেলে, তুমি বিধবা হবে, তুমি গেলে আমার সশ্রম কারাদণ্ড হবে।'

সেই শিক্ষার পর এখন আর লাথি মারি না, ল্যাং মারি। প্রবাদেই তো আছে, পেলের লাথি, লিস্টনের ঘুষি, বাঙালির ল্যাং। ল্যাং যে কত ভাবে মারা যায়, সে যে জানে সে জানে। ল্যাং শিক্ষার কোনো বই নেই, গুরুও নেই। আমরা নিজেরাই শিখে যাই। ওই জ্ঞানটা আমাদের ভেতরেই আছে। ক্রমে ক্রমে মারতে মারতে আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাই।

বাড়িতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা তুলনাহীন ল্যাংইস্ট।

যেই বলা হলো, 'সন্ধ্যার মা, কাল বাবা একটু তাড়াতাড়ি এস। কয়েকজন গেস্ট আসবেন, একলা হাতে পেরে উঠবো না।'

'তুমি কিছু ভেবো না বউদি, দুটো বাড়ি কাল অফ করে দেব।'

বউদি মহাখুশি বেড়ালের মতো ঘড়ঘড় করতে করতে বললেন, 'তোমার কোনো তুলনা নেই গো! অনেক দিন ধরে একটা শাড়ি চেয়েছিলে, এই নাও সেই শাড়ি।'

সন্ধ্যার মা পরের দিন তো এলই না, পরপর তিন দিন কামাই। বউদি নাকের

জলে চোখের জলে। জোড়া গ্যাস ওভেনে, এপাশে কড়া, ওপাশে কড়া। বগ বগ করে ডাল ফুটছে একটাতে আর একটাতে চিংড়ি মাছ। বঁটি, ছুরি, কাটারি সব বেরিয়ে পড়েছে। মেঝেতে আলু গড়াচ্ছে। বেড়াল দুধের ঢাকা খুলে গোঁফ ভেজাচ্ছে। বাইরের কলতলায় কাক টেবল-স্পুন নিয়ে উড়তে পারবে না বলে টি-স্পুন খুঁজছে। পালমশাক আপাদমস্তক স্নান করে শীতে হি হি করছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। সবাই এলো বলে। চাল বাছা হয়নি। ধুন্ধুমার কাণ্ড। এরই মাঝে এক চিটচিটে প্রতিবেশিনী এসে হাজির। তিনি পায়ে পায়ে ঘুরছেন আর একই প্রশ্ন বারে বারে করছেন, 'কত্তার প্রোমোশান হয়েছে বুঝি! তাই এত খাওয়ার আয়োজন।'

'আরে না রে ভাই! এমনি এমনি। ওর অফিসের কয়েকজন অনেকদিন থেকে আসবো আসবো বলছিল। তাই।'

'একা হাতে করছো, আমি তাহলে একটু সাহায্য করি!'

'সাহায্য করবে?' লাফিয়ে উঠলেন বউদি। 'তুমি তাহলে পায়েসটা একটু হাতা

মারো।' প্রতিবেশিনীর প্রতিভা হাতা মারতে মারতে খুলে গেল। তিনি গরম অবস্থায় আধবাটি গুড় ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দধটা ছানা কেটে গেল। বারোটা বেজে গেল পায়েসের।

বন্ধু বললেন, 'অ, তোমরা ভোরের ট্রেন ধরতে চাও! ভাবনা কী, আমি গাড়ি নিয়ে আসবো। নো প্রবলেম। তোমরা রেডি থেকো। ডট স্ম্যাট টাইম।'

বন্ধুপত্নী একেবারে গলে গিয়ে বললেন, 'সত্যি, কী ভাল, কী ভাল আপনি! পরেও ট্রেন আছে, তবে বিশ্রী সময়ে পৌঁছয়।'

'আরে, গাড়ি যখন আছে, তখন এইটুকু সার্ভিস দিতে পারবো না! অপূর্ব আমার জিগরি দোস্ত!' পরের দিন, গাঁটরি গাঁটরা, বেডিং স্যুটকেশ নিয়ে সবাই খাড়া। এই বুঝি আসে পার্থর গাড়ি। ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে। গাড়ির শব্দ শুনলেই সবাই কোরাসে বলে উঠছে, 'ওই এসে গেছে। কথা যখন দিয়েছে, নিশ্চয় আসবে।'

কোথায় কী, ওটা অন্য গাড়ি। ভোঁ করে বেরিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেনই না। ফোন কর, ফোন কর। সাতবারের চেষ্টায় লাইন পাওয়া গেল।

'পার্থ কোথায়?'

'লেপের তলায়।'

'সে কী। বলেছিল....।'

'বলাবলি সব ন'টার পর। ন'টার আগে তার ঘুম ভাঙে না।'

কটাস। লাইন কেটে গেল। অপূর্ব মশারির দড়ি ধরে টানছে, যেন ওটা ট্রেনের চেন। বরানগরে বসে টানলে হাওড়ার ট্রেন থেমে যাবে।

প্রশান্তর মেয়ের বিয়েটা বেশ পেকে এসেছিল। ছেলেটি খুবই ভাল, ইঞ্জিনিয়ার। তেমন খাঁইও নেই। দিন, ক্ষণ প্রায় ঠিক। প্রশান্ত এসে ছেলের বাপকে বললে, 'বিয়ের পর তোমরা কোথায় থাকবে?'

'কেন? এ প্রশ্ন কেন? আমরা এক সঙ্গেই থাকবো।'

'পারবে তো?'

'সে আবার কী কথা!'

'না কথা তো ওই একটা। পার্টি করা মেয়ে। একটা নয় একশোটা বন্ধু। ঢুকে যখন হল্লা করবে, তখন যাবে কোথায়! আর একটা আস্তানা তো চাই।' ব্যস হয়ে গেল। সানাই গেল ফেঁসে। প্রশান্ত বুঝতেই পারলো না ব্যাপারটা কী হলো। এক বাঙালির ভাল কিছু হলে আর এক বাঙালির খুব কষ্ট হয়। বুক ফেটে যায়। অমূল্যবাবুর ছেলে চাকরি পেলেন। সেই শুনে জগন্নাথবাবুর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল।

ভগবান বললেন, 'বৎস! অতিশয় প্রীত হয়েছি, তোমাকে বর দিতে চাই; তবে একটা কথা, তুমি যা পাবে তোমার প্রতিবেশী পাবে তার দ্বিগুণ। বল, তুমি কী চাও?'

ভেবেচিন্তে বললে, 'প্রভু! আমার একটা চোখ কানা করে দিন।'

'এটা একটা বর হলো?'

'আমি আপনার কাছে ভাল কিছু চাইলে আমার প্রতিবেশীর ডবল ভাল হয়ে যাবে যে। তাই একটা চোখ দান করে দিলুম. তাহলে আমার প্রতিবেশী সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাবে, কী মজা!' সুইচে হাত দেওয়া মাত্রই হাতটা চিন্ করে উঠলো। পুরো লাইন শর্ট হয়ে আছে। থাক ওই রকম। একা আমি কেন মরি, তোমরাও মর।

তুমি পয়সা খরচ করে বাগান করবে। আমি এক জোড়া ছাগল কিনবো।

তুমি তোমার জানলায় বাহারি কাঁচ লাগাবে! আমি পাড়ার ছেলেদের ডিউস বল কনে দেব।

তুমি শান্তিতে থাকবে. আমি থাউজেন্ড ওয়াটের মিউজিক সিস্টেম বাজাবো।

তুমি তোমার বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার রাখবে। আমি আমার বাড়ির সব জঞ্জাল ডাঁই করে দিয়ে আসবো।

তুমি পুকুরে মাছের চাষ করে বড়লোক হবে ভেবেছো! আমাদের ফলিডল আছে।

তুমি কারখানা খুলেছ? আমরা ঝান্ডা উঁচিয়ে বন্ধ করার জন্যে তৈরি আছি।

তুমি সমাজসেবা করে নাম করবে! আমরা তোমাকে চোর প্রমাণ করবো।

একবার নির্বাচনে ভোটপ্রার্থী হয়ে দেখ, তোমার কত কলঙ্ক আমরা রচনা করে দিতে পারি!

ভাইয়ে ভাইয়ে খুব মিল! একত্রে সুখে আছো? দাঁড়াও ফেঁড়ে দিচ্ছি।

বাজার করে বাড়ি ফিরছ, মনটা তাহলে বিষিয়ে দি:

'কী! ছেলে থাকতে আপনি?'

'ও একটু দেরিতে ওঠে, তাছাড়া এটা আমার অনেক কালের অভ্যাস, ভাল লাগে, মর্নিংওয়াকও হয়।'

'দেরিতে ওঠে কেন?'

'চাকরিটা তো সাংবাদিকের; ফিরতে দেরি হয়।'

'লক্ষ করে দেখেছেন?'

'কী বলুন তো!'

'সকালে সানগ্লাস, ভুঁড়িটা চড় চড় করে বাড়ছে, সন্ধেবেলা জরদাপান, এই তিনটে কিসের লক্ষণ, জানেন?'

'আজ্ঞে না।'

'বোতলের। বোতল ধরেছে, আর আপনি এই বুড়ো বয়সে ছানি পড়া চোখে বাজারে গুঁতোগুঁতি করছেন। এই হলো কলিকাল! মাথায় যে হনুমান টুপিটা চাপিয়েছেন. বউমা একটু কেচে দিতে পারে না!'

'তারই বা সময় কোথায়! একা হাতে সংসার!'

'এ ছাড়া কী আর বলবেন! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। শান্ত বিচারে দেখবেন, খুঁজে পাবেন সত্য! ইউ আর নেগলেকটেড। আপনি হলেন গিয়ে, অনারারি সার্ভেন্ট।'

'আমার তো এসব মনে হয় না!'

'ইউ আর এ ফুল।'

বেশ বসেছিলেন ভদ্রলোক। চা-বিস্কুট খাচ্ছিলেন। বন্ধু জ্যোতিষী এসে বললে, 'তোর ছকটা আমার কাছে ছিল।'

'কী দেখলি, কী দেখলি?'

'তাই তো ছুটে এলুম। তোকে একটু সাবধান করতে এলুম, যতই হোক, তুই আমার বন্ধু।'

কাপ কেঁপে গেল, চুমুক আটকে গেল। কাঁপা কাঁপা প্রশ্ন : 'খুব খারাপ সময়!'

'যাকে বলে নিদারুণ দুঃসময়। নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়বি। এতকাল যা রোজগার করেছিস সব উড়ে যাবে, বিরাট এক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাবি।'

'তারপর কী মরে যাব?'

'সে হলে তো হয়েই যেত। তোর পরমায়ু অনেক। তোকে মারবে না, ভোগাবে।'

'উপায়!'

'তোর বাড়িতে তো একটা ছোট সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম আছে!'

'আছে।'

'সেইটা গলায় বেঁধে ঘুরে বেড়া, অভ্যাস কর।'

'কী অভ্যাস!'

'ওইটা নিয়েই তো পথে নামতে হবে, মা, আমায় ঘুরাবি কত...বাবা, দুটো পয়সা।'

এই হলো লাস্ট ল্যাং।

ঘুঘু

'কি হল তোর? মুখে একটা চাপা উত্তেজনা! ফুটবল ফাইনালে মাঠে নামার আগে গোলকিপারের মুখে যেমন দেখা যায়! হাফ উদ্বেগ, হাফ উত্তেজনা!'

কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকার পর বিকাশ বললে, 'জীবনের একটা টার্নিংপয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছি। যে কোনো দিন একটা ম্যাডাগ্যাসকার কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।'

অক্ষয়বাবু বিকাশের এক বয়স্ক প্রাণের বন্ধু—অক্ষয় দা। নিজের বাড়ি আছে। সেই বাড়ির নিচের তলায় ছোট্ট একটা ঘরে নিজের মতো থাকেন। বহুকাল আগে স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে তার বউ নিয়ে ওই বাড়িতেই বেশ সরবে আছে। সকাল, সন্ধে নিয়মিত ঝগড়া। ঘটি বাটি ছোঁড়াছুঁড়ি। সারা বছরই শ্বশুর বাড়ির কেউ না কেউ থাকেন, মেয়ের তরফে লড়াই করার জন্যে। মাঝে মাঝে, দুটো কথা প্রায়ই শোনা যায়-নারীকণ্ঠে—'ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে ছেড়ে দেবো তোমার!' আর পুরুষ কণ্ঠে—'একদিন খোঁটা সমেত টেন্ট উপড়ে দেবো।'

অক্ষয়বাবু নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে এনেছেন। মন তুলে নিয়েছেন। নানা কথা কানে এলেও গ্রাহ্য করেন না। কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই। আগে চেষ্টা করতেন। ব্যর্থ চেষ্টা। পরে বুঝে গেলেন, এইটাই ওদের বেঁচে থাকার ধরন। কাঠঠোকরা কাঠে ঠোঁট ঠুকবেই। কাকাতুয়া লঙ্কা খাবেই। বেড়াল আদরে ঘড়ঘড় করবে আবার পরক্ষণেই আঁচড়াবে। অক্ষয়বাবু একটা বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করতেন। সেখানে তাঁর ওপরঅলা এক বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার একটি ইংরেজি সারা দিনে অন্তত একশোবার বলতেন— নো ম্যাটার। সেইটি অক্ষয়বাবু রপ্ত করেছেন— সব ম্যাটারই নো ম্যাটার।

বিকাশের অক্ষয় দাদা বললেন, 'আমাদের জীবনের আবার টার্নিংপয়েন্ট কি রে! স্ট্রেট লাইন, রেল লাইনের মতো পড়ে আছে। এ-দিক দিয়ে ঢুকবি ও-দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবি। মাঝের পথটুকুতে—তাই রে নাই রে নাই করবি। অনেক ভাগ্য করলে মানুষ বাঙালি হয়। তিন ছটাকি খোল। সামান্য দানা-পানি, ধুঁকতে ধুঁকতে পথ চলি, সম্বল শুধু, একমাত্র সম্বল—অম্বল। আমাদের জাতীয় ফল, আমড়া। আমাদের জাতীয় পক্ষী হল কাক। আমাদের জাতীয় পশু হল লেড়ি কুত্তা। আমাদের জাতীয় অস্ত্র হল, বাঁশ। আমাদের শাস্ত্র হল, পরচর্চা। আমাদের সাধনা হল, পেছনে লাগা। আর আমাদের ধ্রুবতারা হল, বউ। গীতা, উপনিষদ নয়, বইয়ের বাণী নয়, বউয়ের বাণী। ওই যে, কান দুটো খাড়া করে শোনো!'

বিকাশ শুনতে পাচ্ছে—দোতলায় দক্ষযজ্ঞ। ফটা বাঁশের মতো, চেঁচারি চেরা গলায়, অক্ষয়দার পুত্রবধূ, অক্ষয়দার ছেলেকেই শাসন করছে, 'তোমাকে আমি কি বলেছিলুম, কি বলেছিলুম তোমাকে আমি! কারো ব্যাপারে নাক গলাবে না। কেমন হাম্পু! কেমন হাম্পু দিয়েছে! আমার উপদেশ শুনেছিলে! বারবার বলেছিলুম, বারবার, বারবার।'

অক্ষয়দা নিজের মনেই বললেন, 'দে না মাথাটা কামিয়ে দে না, 'বারবার' ডেকে এনে মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে দে। বিয়ে করে নিত্যানন্দ!' খাট থেকে উঠে গিয়ে ভেতর দিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দিলেন। নানা রকম শব্দ আসতে লাগল, তবে কথা বোঝা যাচ্ছে না। একবারই মাত্র কানে এল, 'যেমন বাপ তার তেমন ছেলে!'

অক্ষয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সমস্যাটা কি? চাকরি বাকরি করছ, খাচ্ছ দাচ্ছ, ঘুরে বেড়াচ্ছ। এই ভাবেই চালিয়ে যাও। স্ট্রেট ড্রাইভ। লাল দেখলে থামবে, হলদে দেখলে প্রস্তুত হবে, সবুজ দেখলে স্টার্ট। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে হলে ইণ্ডিকেটার।'

বিকাশ বললে, 'মা খুব ধরেছে।'

'সে তো সুখের কথা রে! মা ছেলেকে ধরেছেন। কত বড় সৌভাগ্য তোর। একালে জন্ম আছে, ব্যাস, ওই পর্যন্ত। নো ফাদার, নো মাদার! নো স্নেহ, নো প্রেম! আমাদের কালে সুধীরলাল চক্রবর্তীর একটা গান খুব পপুলার হয়েছিল—প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে কে জেগে রয় দুখের রাতে! সে মা আর নেই রে। তোর আছে। এখন মায়েরা সব মাম্মি। বাবারা হল ড্যাড। চতুর্দিকে আন্ট আর আন্টি।'

বিকাশ বললে, 'দাদা, এ-ধরা সে-ধরা নয়, মা বলছেন, খোকা, আমার বয়েস হল, তোকে এইবার বিয়ে করতে হবে, আমি একটি মেয়ে দেখেছি।'

অক্ষয়বাবু বললেন, 'বিয়ে? আগে বুড়িদের তবু একটা যাওয়ার জায়গা ছিল কাশী। তোমার মা যাবেন কোথায়? কোনো ব্যবস্থা করেছেন?'

'মা যাবেন কেন? মা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, বা আমরা মায়ের সঙ্গে থাকব।'

'অতই সোজা! এ কি রকম জানিস? একটা পাইপ, এদিক দিয়ে ঠেলবি ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বউয়ের এন্ট্রি মায়ের এগজিট।'

'অক্ষয়দা, তুমি সিনিক হয়ে গেছে। কেউ কি বিয়ে করছে না?'

'অবশ্যই করছে। বয়েসের ধর্ম। তুমি মুখে যাই বল, তোমারও ষোলো আনা ইচ্ছে আছে। ইচ্ছে যখন আছে করে ফেল। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে সোজা চলে যাও। পিঁড়েতে বসে পড়। বউ ভাতে গুচ্ছের লোক খাওয়াও আর এন্তার আবর্জনায় ঘর ভরো। আর বছর না ঘুরতেই তাসা পার্টি। যাই করো, বিয়ের আগে উকিল ধরে অ্যাডভান্স বেল নিয়ে রাখবে। এটা হল ফোর নাইন্টি এইটের যুগ।'

'সে আবার কি?'

'সে একটা এসেছে নতুন আইন। ধরো, তুমি তোমার বউকে বললে, একটু সরে শোও, সে অমনি সোজা উঠে তরতরিয়ে থানায় গিয়ে তোমার নামে একটা এফ আই আর করে এল, তোমার মাকেও জড়িয়ে দিলে। আমার ওপর মেন্টাল টরচার

হচ্ছে। ব্যাস্ তোমার খেল খতম। থানা থেকে পুলিস এল, নড়া ধরে খাবার থালা থেকে মাঝরাতে তুলে নিয়ে গিয়ে সোজা লকআপে। সেখানে আর পাঁচটা দাগী আসামীর সঙ্গে ভূমিশয্যা। বিয়ে না করে তোর কি খুব অসুবিধে হচ্ছে!'

'অসুবিধে হবে কেন?'

'দিব্যি খাচ্ছিস দাচ্ছিস। মাকে নিয়ে আছিস। ফুরফুরে জীবন!'

'তা নয়, তবে মা একজন সঙ্গী চাইছে, এই আর কি?'

'বুঝেছি, তোমারও ষোল আনা ইচ্ছে। মেয়েটিকে দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'দেখে কি বুঝলে?'

'মায়ের কাছে সেদিন এসেছিল। লাজুক। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল।'

'মাকে কি বলে ডাকছিল? মাসি?'

'না, মা, মা করছিল। চারশো আটানব্বই করবে মনে হল না।'

'দেখতে কেমন?'

'স্লিম, ফর্সা, ধারালো মুখ, বেশ খাড়া নাক, বড় বড় চোখ।'

'তার মানে সুন্দরী।'

'সেই রকমই মনে হল।'

'মনে হল আবার কি? মনে বসে পড়েছে এখন পিঁড়েতে বসলেই হয়। কণ্ঠস্বরটা কেমন?'

'বেশ সুরেলা। গান-টান করে।'

'লেখা-পড়া!'

'বি.এ. করেছে।'

'বাঃ বাঃ সোনায় সোহাগা। চাকরি করবে না সংসার করবে?'

'সে সব কিছু বলে নি।'

'আজকালকার নিয়মে বিফোর ম্যারেজ মিটিং হয়েছে?'

'না, ওসবের প্রয়োজন হবে না।'

'তাহলে লাগিয়ে দাও। এখন ফাল্গুন মাস! এইরকম এক ফাল্গুনে আমারও বিয়ে হয়েছিল রে! সে কি সাজ! গরদের পাঞ্জাবি, চুনোট করা ধুতি। পাঞ্জাবিটা এখনো আছে। পোকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছে। তবে আছে। পাটে পাটে পাট হয়ে। এক সেট সোনার বোতাম। বউয়ের বেনারসীটাও আছে। সেটারও একই অবস্থা। বুঝলি, পোকাদের কোনো সেন্স নেই। অবশ্য স্মৃতিও এক ধরনের পোকা। মানুষকে ফুটো ফুটো করে দেয়। বিয়ের পর আমরা পুরী গিয়েছিলুম। সমুদ্রের ধারে বসে আছি, পাশে ঘোমটা দেওয়া বউ! ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ভিজে ভিজে চিটচিটে বাতাস। খুব ফর্সা ছিল, আমি নাম রেখেছিলুম লালী। সমুদ্র আছে, বেলাভূমি আছে, ঢেউ আছে, ফেনা আছে, ছড়ান ঝিনুক আছে, জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে, নেই

আমার লালী। শোন বিয়ে যদি লেগে যায়, জীবনে বউ যদি ফিট করে যায়, তার চেয়ে মারভেলাস কিছু নেই। লড়াই করতে করতে কতটা পথ যেতে হবে বল তো, যৌবন থেকে বার্ধক্য পেরিয়ে চিতা। এ লং ওয়ে। মনের মতো একজন সঙ্গী চাই না! গল্প করতে করতে বেশ যাওয়া যায়, সুখ দুঃখের পান-মশলা চিবোতে চিবোতে। পুরী থেকে একটা সিঁদুর কৌটো কিনেছিল। সেটা আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝে বের করে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে একটি আয়না দেখি, একটা মুখ দেখি। মেয়েদের চুল বাঁধা আর সিঁদুর পরা একটা দেখার জিনিস। যাক. বিয়েটা করেই ফেলো। না করেই বা করবে কি? বিয়ে না করলে মানুষের জীবন দানা বাঁধে না।'

বিকাশ যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

অক্ষয়দা বললেন, 'শোন, খাওয়া-দাওয়াটা আমাদের কালে যেমন হত, সেই ভাবে করিস! হালুইকর। ক্যাটারার ঢোকাস না। বউভাত মানুষের জীবনে একটা অক্ষয় স্মৃতি।'

বিকাশ বেরিয়ে এল পথে। বেশ একটা আনন্দ আসছে মনে। সংসার হবে। একজন আপনজন আসছে। জীবন সঙ্গিনী। কত দিন, কত রাত, কত কথা, কত পরিকল্পনা! সাত আটদিন পরে বিকাশ অফিস থেকে ফিরছে। একটু রাত হয়েছে। বিয়ের কেনাকাটা শুরু হয়েছে। বউবাজারে গয়নার দোকানে দরদস্তুর করতে গিয়েছিল। বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে অনেকদিন পরে। রঙ হচ্ছে।

ষষ্ঠীতলার কাছটায় চির অন্ধকার। একটা বটগাছ আছে। পাড়ার একটা ক্লাব বেদী করে রেখেছে। আড্ডা হয়। অল্প দূরেই মেয়েদের স্কুল। এই বটতলাটা তাদের কাছে আতঙ্কের। সিটি, অশ্লীল কথা, সময় সময় হাত ধরে টানার চেষ্টা সবই হয়। প্রবীণ শিক্ষক প্রভাতবাবু প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছে। পাড়ার লোক তাতে ক্ষিপ্ত না হয়ে মন্তব্য করেছিল, বেশি মাতব্বরি করতে গেলে ওই অবস্থাই হয়। একটা বয়েসে ছেলেরা একটু আধটু ওইরকম করেই থাকে। পুলিসের বক্তব্য, অন্য অনেক সমস্যা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এই সব ছ্যাঁচড়া ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের নেই।

বিকাশ ওই জায়গাটা পা চালিয়ে পার হয়ে যেতে চাইল। এখানে এলেই বিশ্রী লাগে। উল্টো দিক থেকে একটা মোটর সাইকেল আসছে হেডলাইট জ্বেলে। গাড়িটা তাকে অতিক্রম করে গিয়েও আবার ঘুরে এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল। আরোহী দুজন যুবক। বিকাশের খুব চেনা লাগল। দুজনকেই সে দেখেছে। প্রায়ই দেখে।

একজন বললে, 'বিকাশ না! ভাল আছ?'

বিকাশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'ভাল আছি।'

সঙ্গে টাকা পয়সা আছে। ব্যাঙ্কে গিয়েছিল। কেড়ে নিলে কিছুই করার নেই। চিৎকার করলেও কেউ আসবে না।

ছেলেটি বললে, 'ভাল থাকতে চাও?'

বিকাশ বললে, 'কে না চায়?'

'তাহলে পাপিয়াকে বিয়ে করবে না।'

বিকাশ বললে, 'কেন।'

'পাপিয়াকে বিয়ে করব আমি। পাপিয়া আমার।'

'ভালবাসা!'

ছেলেটি বিদ্‌ঘুটে হেসে বললে, 'ভালবাসা? ওসব আমাদের রক্তে নেই। আমাদের আছে ভাল লাগা। তুমি অপেক্ষা করতে পার, সেকেন্ড হ্যান্ড হলেই ফেলে দোবো. তখন তুলে নিতে পার। নতুন গাড়ি চড়ার ভাগ্য তোমার হবে না।'

'পাপিয়ার বাড়িতে জানে?'

'বাড়ি ফাড়ি আবার কি? তুলবো আর ফেলব।'

'পাপিয়ার মত আছে?'

'এই লাও, নালায়েকের মতো কথা। মানুষ আমাদের কাছে মুরগী। ধরবো আর ক্লিক্। ত্রিলোকের কাছে কার্ড ছাপাতে দিয়েছ? তুলে নিয়ে এসো।'

বিকাশ বললে, 'বিয়েটা হবে।'

'কার সঙ্গে?'

বিকাশ বললে, 'যার সঙ্গে হওয়ার তার সঙ্গেই হবে।'

ছেলেটা তার সঙ্গীকে বললে, 'রেলা নিচ্ছে রে! ছাঁদনাতলার বদলে এখানেই চমকাইতলা করে দোবো।'

সঙ্গী বললে, 'ছুঁচো মেরে কি হবে? পাপিয়াকে তুলে নিলেই তো হবে!'

বিকাশ বললে, 'কিচ্ছু দরকার নেই। ও মেয়েকে আর আমি বিয়ে করছি না। দেশে মেয়ের অভাব নেই। তোমাদের যা খুশি তাই করো।'

ছেলেটি বললে, 'এই তো লক্ষ্মীছেলে। বুঝেছে, আমাদের সঙ্গে কাজিয়া করে লাভ নেই। ব্যাপারটা কি জানো, মেয়েটাকে আমরা অনেকদিন নজরে রেখেছি। ফল গাছে থাক, পাকলেই পেড়ে নোবো, এই আর কি! তার পরে পাওয়ারের ব্যাপার আছে। আমরা এখন পাওয়ারফুল। থানা-পুলিস কি করবে আমাদের! আমাদের শত্রু আমরাই। ঠিক আছে দোস্ত। সরি! মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলুম। তোমার বিয়েতে পাপিয়াকে নিয়ে আসব। ভালো উপহার আনব।'

মোটর সাইকেলের মুখ ঘুরে গেল। কারণে অথবা অকারণে তীব্র বেগে দক্ষিণমুখো। বিকাশ বল ফিরে পেয়ে আবার হাঁটছে। কয়েক পা গেছে। ভীষণ একটা শব্দ। পেছন দিকে, যেদিকে মোটর সাইকেলটা গেল সেই দিকেই।

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা হই হই কানে এসেছে। কি হল? কৌতূহল। এই রাস্তাটা কিছু দূর গিয়েই বড় রাস্তায় উঠেছে। বিকাশ এগিয়ে গেল। বড় রাস্তার মুখেই ভিড় জমে আছে। কে একজন ইংরিজিতে বলছে, 'স্ম্যাশড।'

বিকাশ বক্তাকে চিনতে পারল। তারই বন্ধু, পার্থ। বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে রে!'

'আরে, এ যুগের যা ব্যামো, গতি। হাই স্পিড ডেথ। এ এদিক থেকে বেরলো ঝড়ের বেগে। ওদিক থেকে টপ স্পিডে তিরিশ টন লরি। নটার পর লরি ছেড়ে দেয়। হয়ে গেল।'

লাল আর বেগুনী রঙের একটা তালগোল। একটু আগেই এটা ছিল একটা মোটর সাইকেল। বিশ তিরিশ হাত দূরে ছত্রাকার দুটো নরদেহ। একটু আগেই এরা ভয় দেখাচ্ছিল বিকাশকে।

পার্থ বললে, 'চ, দুটো কমল।'

'চিনিস ওদের?'

'চিনি না! সপ্তাহে একবার করে আমার দোকানে তোলা আদায় করতে আসে। কমুক। এই ভাবে কমুক। জানিস তো, মাঝে মাঝে মনে হয় ভগবান আছেন।' ত্রিলোক বিকাশের জন্যেই বসেছিল, 'তোর এত দেরি হল? এই নে কার্ড রেডি। একটা প্যাকেটের বাইরে বের করে রেখেছি। দেখে নে, সব ঠিক আছে কি না!'

হ্যালোজেনের আলোয় সোনার জলে ছাপা অক্ষর ঝলমল করছে। বিরাট বড় একটা প্রজাপতি। প্রজাপতিটা একটু আগে মরে গিয়েছিল। বিকাশের মনে হল, প্রজাপতিটা এখন ডানা মেলে উড়ছে।

ছোরা ছুরি

আমার কাকা, পঙ্কজ কাকা বড়ো মজার মানুষ। অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিলেন। ত
নিজেকে বলেন ইললেটারেট।

'তুমি যদি নিজেকে ইললিটারেট বলো, তাহলে আমরা কী? এটা তোমার বিনয়

'তোদের এই দোষ! কোনো কথা ভাল করে শুনিস না। আমি ইললিটারেট বলিনি
বলেছি ইললেটারেট। একালে যারাই পাস করে তারা দেখবি ছটা, সাতটা করে লেটা
পায়। আমাদের কালে কেউ একটা লেটার পেলে, বাড়ি চুনকাম করা হত।'

'চুনকাম কেন?'

'ওই যে, একালে মানুষ শেয়ারে টাকা ইনভেস্ট করে, সেকালের বড়লোক
টাকা ইনভেস্ট করত জামাইতে। একে বলা হত জামাইকামাই। শ্বশুরের টাকা
ওয়ানলেটারেট চলে যেত বিলেতে। কেউ হয়ে আসত পেট কাটা সার্জেন, কার
সেকালে ছুরিটা বেশির ভাগই পেটে চালান হত। পেটের মতো জায়গা পৃথিবীতে
আর পাবি! রায়টের সময় পেটে গুণ্ডার ছুরি, তারপর সার্জেনেরে ছুরি। এই দে
পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গে কত তফাৎ! ছোরায় মরলে বলবে খুন, আর সার্জেনের ছুরিতে
মারলে বলবে, অপারেশনে ইজ সাকসেসফুল বাট দি পেশেন্ট ইজ ডেড। এই
যুগযুগান্তর ধরে নারীজাতির ওপর পক্ষপাতিত্ব।'

'এর মধ্যে তুমি নারী পেলে কোথায়?'

'অ্যায়! ওই জন্যই বলি—ব্যাকরণ পড়, ব্যাকরণ। ছোরা হল পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলি
ছুরি। কোন সূত্র ধরে? ওই যে, ছোঁড়া, ছুঁড়ি, বুড়ো, বুড়ি, বড়া আর বড়ি। পেটের
মতো তীর্থস্থান আর আছে রে! ওইজন্যে বলে পেটপুজো! পিলপিল করে তীর্থযাত্রী
সব ওইখানে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করছে, কাটলেট স্যালাডের নৈবেদ্য নিয়ে। মাছের
ঝোল ভক্তির অশ্রু নিয়ে, রুটি তার আসন নিয়ে, লুচি তার পেটফুলো বাতাসের
অহঙ্কার নিয়ে, পরোটা তার আধ্যাত্মিক ত্রিকোণ নিয়ে, রসগোল্লা তার রসের ভূমণ্ড
নিয়ে, যাচ্ছে বৈষ্ণবী মালপো, দিদিমা নারকোল নাড়ু, বৃন্দাবনের মাসি গোকুল পিঠে,
মেহনতি জনতার লাল সেলাম মিছিলের বোঁদে, ফেজ পরা সিঙ্গাড়া, কুচক্রী অমৃতি
ষড়যন্ত্রকারী চানাচুর, অহঙ্কারী খাস্তা কচুরি, বলিপ্রদত্ত ছাগল, আর বাড়াব?'

'নাও, ছেড়ে দাও! তীর্থস্থানে অনেক যাত্রী।'

'তীর্থে গেলে কী হয়! পুণ্যাত্মা হয়, ব্রহ্মে চলে যায়। আকার থেকে নিরাকার। দুরাত্মার তো উদ্ধার নেই রে! যতক্ষণ পুণ্যাত্মার সঙ্গে থাকে ততক্ষণ দুর্গন্ধ মালুম হয় না। বুঝলি ব্যাপারটা!'

'একেবারে ক্লিয়ার!'

'কি রকম ক্লিয়ার! ইসবগুলের ভুসি খাওয়া ক্লিয়ার! পেট শরীরের কেন্দ্রস্থল, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। দুনিয়াটাকে চালাচ্ছে পেট। ওইটাই ভগবানের হেডকোয়ার্টার। ওইজন্যেই এইসব কথার এত গুরুত্ব— পেটের কথা, পেটের ছেলে, পেটের শত্রু. তোর পেটে পেটে এত ছিল! তাহলে, বুঝতে পারছিস, আমাদের সময় বেশিরভাগই হয়ে আসত পেটকাটা সার্জেন। আর হত ইঞ্জিনিয়ার। আর যার কোনো এলেমই থাকত না, হত ব্যারিস্টার, বার অ্যাট ল। বার অ্যাট ল তোরা দেখিসনি। আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন বাংলা সিনেমায় প্রায়ই দেখা যেত। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ঠোঁটে পাইপ হাতে মদের গেলাস, বউ ছেড়ে পার্টিতে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম। ক্রনিক আমাশার মতো। ক্রনিক প্রেম। ব্যারিস্টাররা সাধারণত ব্রিফলেস হত।'

'ব্রিফলেস মানে?'

'মানে হাতে কোনো মামলা মকদ্দমা থাকত না। সেকালের বাজার দ... পাঁচসিকেতে উকিল পাওয়া যেত রঙচটা কালো কোট পরা, রেশমের গাউনপরা দ... গিনির ব্যারিস্টারকে কে কেস দেবে! দু একজন নামকরা ছাড়া বেশির ভাগই ত... ব্রিফলেস।'

'ঠাটবাট রাখত কি করে?'

'ভেরি ইজি, শ্বশুরের টাকায়। এদের বউরা সব পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইত, ওই মালতী লতা দোলে। সব সময় দামি দামি সিল্কের শাড়ি পরত, আর বেশিরভাগ সময় রাগে অভিমানে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে থাকত, আর ইনভেরিয়েবলি একটা পিসতুতো কি মাসতুতো ভাই প্রেম করতে আসত।'

'তুমি এত সব জানলে কি করে?'

'তোরা যে কিছু শিখতে চাস না। আমাদের কালের বাংলা সিনেমা ছিল জ্ঞানের খনি। চুলকাটা থেকে নখকাটা সব শেখা যেত। ছবি বিশ্বাসের কাছ থেকে জমিদারি কায়দা, বিকাশ রায়ের কাছ থেকে বদমাইশি, উত্তমকুমারের কাছ থেকে প্রেম। আমরা রোজ সুচিত্রা সেনকে একটা করে প্রেমপত্র লিখে শীতলাতলায় রেখে আসতুম। একবার উত্তমকুমারের কায়দায় চুলে ইউকাট মেরে জুতোপেটা খেয়েছিলুম। তারপর এক মাস মহাপ্রভু!'

'মহাপ্রভু মানে?'

'মানে নেড়া। ওইটাই তো আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।'

'কি রকম?'

'উল্টো রথের মতো উল্টো সন্ন্যাস। মহাপ্রভু সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, আমি সংসারে ঢুকলুম। উঠে পড়ে মেয়ে দেখা শুরু হল। হরেক রকম মেয়ে। তাদের একজনও সুচিত্রা সেনের মতো নয়। জানিস তো কদাচিৎ একজন সুচিত্রা সেন জন্মায়, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রডিউসার ডিরেকটররা কপাৎ করে কবজা করে নেয় আর উত্তমকুমারকে উপহার দিয়ে দেয়। এ জীবনে কিছু হল না রে হাবলা। দীর্ঘশ্বাস ফেলেই কেটে গেল।'

'কি বলছ তুমি? কাকীমা তো বেশ ভালই।'

'তা ভাল। একেবারে মা শীতলার মতো। হবে না! অত প্রেমপত্র! সারাটা যৌবন বেড়াল হয়েই কাটালুম।'

'বেড়াল তো মা ষষ্ঠীর বাহন! শীতলার বাহন তো...'

'জানি নামটা নাই বা বললি! আমি বাহন এক্সচেঞ্জ করেছি। তোর কাকী অবশ্য রাজি নয়। অতিশয় বেড়াল বিদ্বেষী। সদ্য বিয়ের পর চাঁদিনী রাতে প্রেম করতে গেলুম। তোর কাকী বললে সরে শোও, আজ ভীষণ গরম। ঘরে একটা ফ্যান লাগিয়েছে দেখ, মধু পক্কি, যত না হাওয়া তার চেয়ে বেশি আওয়াজ! যেন ঘরের মধ্যে একটা এরোপ্লেন ঢুকে বেরতে পারছে না!' 'খুব সোহাগ করে বললুম, হয়েছে কি, সবে

লক্ষ্মীলাভ, এরপর তোমাকে ভারি প্রেমিক চেহারার একটা মোটর গাড়ি কিনে দোবো, লাল টুকটুকে রঙ। বাঘের মতো একটা হাই তুলে, জড়ান গলায় বললে, থাক্ আমার গাধাই ভাল। হুড়ুম করে পাশ ফিরল, আমার বদলে আমার পাশ বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। চোখের সামনে ধীরে ধীরে চাঁদের আলো মরে গেল। একটু পরই একটা কাক কা কা করে চিৎকার শুরু করল। আমাদের কালের যত মেয়ে সব বউ হতে জানত, প্রেমিকা হওয়ার এলেম ছিল না!'

'তা ঠিক! একালে আবার কেসটা উলটে গেছে। সবাই প্রেমিকা, বউ নেই একটাও।'

'ওই ত, বউ হলেই প্রেম পাংচার। প্রেম হল দই পাতা। দুধ গরম করলি ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় মেরে দে দম্বল। এইবার নির্জনে রেখে দে, শান্তিতে। বেশি নাড়াচাড়া করলে দই জমবে না। তোদের ময়দানে আগে যখন খুব যেতুম তখন গাছের তলায় তলায়, জোড়ায় জোড়ায় এই দম্বল কেস খুব চোখে পড়ত। এখন তো শুনি দই পাতা আরো বেড়েছে। কেরামতির দইকে বলে, পয়োধি। পয়োধি মানে সমুদ্র। সংসার সমুদ্র। তখন দম্বল কেস হয়ে যায় ডাম্বেল কেস। আয় ভাঙি দাঁতের গোড়া।'

'কাকীমা কাছাকাছি নেই বলে যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছ।'

'আমার লাইসেন্স নেওয়া আছে খোকা। তোর কাকী তো আমার উইকেট কিপার।'

'তুমি ফিল্ডিং-এ, না ব্যাটিং-এ?'

'সব সময় ব্যাটিং-এ।'

'তাহলে কাকীমা উইকেট কিপার হলে তোমার লাভটা কী!'

'বহুত লাভ। খেলায় সতর্কতা বেড়েছে। সব সময় ক্রিজে আছি। একটু অসাবধান হয়েছ কি বেল ফেলে দেবে। বোকার মতো আউট।'

'কলেজ টিমে তুমি তো দারুণ খেলতে! বাংলাদলেও তো খেলেছ! চার ছয়ও তো মারতে খুব। হঠাৎ সব ছেড়ে লোহালক্কড়ে ঢুকলে কেন?'

'খেলা ছেড়েছি কোথায়! সমানে খেলছি। আমৃত্যু খেলে যাব। এ তোর ওয়ান ডে, কি পাঁচ দিনের টেস্ট নয়। লাইফ লং ক্রিকেট। কত বড় ফিল্ড! তার মধ্যে এক একজনের এক এক মাপের বাউন্ডারি। বড় শিল্পপতির বিরাট বাউন্ডারি। ছোট কেরানির ছোট বাউন্ডারি। দালালদের আর এক রকম বাউন্ডারি। আর উইকেট হল, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান। মাথার ওপর ছোট্ট 'বেল' দুটি হল নড়বড়ে পিতা, মাতা। তিনটে স্ট্যাম্প পিচে পোতা, নড়বড়ে বেল দুটো আলগা ওপরে পড়ে আছে ব্যালেন্সের ওপর। সামান্য একটা টুসকিতে ছিটকে পড়বে। তখন মহাকাল হল গিয়ে তোমার বোলার। সে তোমাকে সারা জীবন স্লো বল করে যাবে। মাঝে মধ্যে একটা দুটো

বাউনসার। যেমন ধর হার্ট অ্যাটাক, অ্যাকসিডেন্ট। তখন তুমি কোন ব্যাটে খেলবে? মেডিসিনের ব্যাটে। ডিফেনসিভ খেলা। তখন আর 'ওয়ান ডে' নয়। ক্লাসিক টেস্ট ম্যাচ। প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, তোমার কর্মস্থল থেকে অনবরতই আসতে থাকবে নানা চরিত্রের বল, কোনোটা ফাস্ট, কোনোটা গুগলি, স্পিন, ইয়র্কার। কিছু বল পাবে, বাংলা-বল, তার নাম দাঁও, তখন বেধড়ক ব্যাট চালাও, ওভার বাউন্ডারি। মাঝে মধ্যে রিস্ক তোমাকে নিতেই হবে, নো রিস্ক নো গেন। তবে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের জন্যে রান বিটুইন দি উইকেটস। আমাদের এই বড় ধরনের টেস্ট ম্যাচে তুমি দু ধরনের উইকেট পাবে। গুড উইকেট আর স্টিকি উইকেট। শোনো ক্রিকেট আর ক্যানসার দুটোই এক গোত্রের। ক্রিকেট হল 'গেম অফ ম্যাগনিফিসেন্ট আনসারটেন্টি', আর ক্যানসার হল, 'ডিজিজ অফ ম্যাগনিফিসেন্ট আনসারটেন্টি।'

'তা কাকীকে বিপক্ষের উইকেট কিপার করলে কেন?'

'শোন, স্ত্রীরা সব সময় উপকারী উইকেট কিপার। তার ভয়েই স্বামীরা ক্রিজে শান্ত সংযত হয়ে খেলে। তা না হলেই তো রান আউট। সেদিন আমার এক বন্ধুর ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম, প্রশ্ন করলুম, বিয়ের পর তুমি কি ধরনের বল করবে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাউন্সার। প্রশ্ন করলুম, ব্যাট? বললে, স্কোয়ার ড্রাইভ। আজকালকার মেয়েরা কি হয়েছে রে!'

'মাথাটা ফাটালে কি করে? ব্যান্ডেজ বেঁধে পড়ে আছ?'

'আমাদের সময় গার্ড না পরেই তো খেলতুম। সেই অভ্যাসটাই রয়ে গেছে। আর চলবে না মনে হচ্ছে, এবার থেকে সকলকেই হেডগার্ড, ফেসগার্ড, সিনগার্ড পরে ট্রেনে উঠতে হবে। বাইরে থেকে কখন কি বল আসবে কেউ জানে না। বল আর বোলারের তো অভাব নেই। আমার মতো অবস্থা হবে। দেশে এখন পূর্ণ স্বাধীনতা। ধর, কারো ইচ্ছে হল, তিনতলার ছাত থেকে আস্ত একটা থান ইট নীচে ফেলে দেখবে, কী হয়! সঙ্গে সঙ্গে একজন হাসপাতালে। অথবা, বল হরি। একজনের মনে হল, চুপচাপ বেকার বসে থেকে কী হবে! কয়েকটা আধলা ইট চলন্ত ট্রেনের কামরার দিকে ছুঁড়ে দেখি না কী হয়! এই দেখ ভাই, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে পড়ে আছি বিছানায়। দেখে যাও কী হয়! একে বলে, এইচ বি ডব্লু। হেড বিফোর উইকেট! কী ঠিক বলেছি?'

'বেশ বলেছ। এখন মাকে গিয়ে কী বলব?'

'বলবি, কেস এখন থার্ড আম্পায়ারের হাতে। লাল, সবুজ, কোনো আলোই জ্বলেনি।'

টানাটানি

'একটা সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সংসার তৈরি করব আমরা।

প্রশান্ত এই কথাটি বলে চায়ের কাপে নিশ্চিন্ত চুমুক চালাল। ঝাপসা সকাল। প্রচণ্ড বৃষ্টি। পাট করা বাজারের ব্যাগ পাশে। তার পাশে ফোল্ডিং ছাতা। ছাতায় এ ? আটকাবে না। প্রমীলা উদ্বিগ্ন মুখে আর একটা আসনে। সামনে শার্সি বন্ধ জানলা। ঘুটঘুটে কালো একটা আকাশ। প্রমীলা বৃষ্টি একটুও ভালবাসে না। মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে। জল, কাদা, প্যাচপ্যাচ। কাপড় জামা শুকোয় না। সর্ব অর্থে একটা বাজে ব্যাপার। উত্তরবঙ্গের সেই বন্যার স্মৃতি, মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়।

প্রমীলা গম্ভীর গলায় বললে, 'কী রকম?'

প্রশান্ত বললে, 'নতুন শতাব্দী। সব কিছু এমন ভাবে বদলে যাবে, পুরনোর ছিটে ফোঁটাও থাকবে না। নতুন রকমের মানুষ, সমাজ, জীবন, বিশ্বাস!'

'হাত-পা, মাথাঅলা মানুষ থাকবে তো!'

'তা থাকবে।'

'ব্যাস! তাহলে যা আছে তাই থাকবে। সাধারণ মানুষের সংসারে বিজ্ঞান! তোলা উনুনের বদলে গ্যাস। রেডিওর জায়গায় টিভি। পাম্পে করে জল ছাতে তুলে নিচে নামান। ঠোঙার বদলে প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ! রুটির বদলে চাউ। ডিম পাড়া মুরগীর বদলে ডিম না পাড়া মুরগী। এই তো তোমার বিজ্ঞান!'

প্রশান্ত বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, 'কিছুই জান না! এটা যেমন দুঃখের সেই রকম আনন্দেরও। বেশ নিশ্চিন্ত থাকা যায়। শুনে রাখো, মানুষের সঙ্গে আর মানুষের প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতা কম্পিউটারের। মানুষকে কম্পিউটার হতে হবে। তা না হলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নর্দমায়!'

'কম্পিউটারের মতো হলে কি হবে?'

'ধরো আমি একটা কম্পিউটার, তুমি একটা কম্পিউটার। দু'জনে বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। সকালে উঠে বোতাম টেপামাত্রই, ঝট্‌, তুমি চা নিয়ে এলে। আজ একরকম চা, কাল একরকম নয়। প্রত্যেক দিন ক্লাস ওয়ান।'

প্রমীলা বললে, 'আর আমি উঠে কোন বোতামটা টিপলে তুমি ঝট্‌ করে চা নিয়ে আসবে?'

'কম্পিউটার সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়া নেই। কম্পিউটারের মেমারি

বলে একটা জিনিস থাকে সেইখানে ভরে দেওয়া হয় প্রোগ্রাম। কর্তব্য তালিকা। তুমি হলে ফিমেল কম্পিউটার, আমি হলুম মেল। তোমার মেমারিতে ঠিক সকাল সাড়ে ছটায় চা করা, আমার মেমারিতে ঠিক সাড়ে ছটায় চা খাওয়া।'

'এই মিলেনিয়ামে ওটা উল্টে যাবে ভাই। হাজার বছর ধরে তোমরা মেয়েদের সেবাদাসী করে রেখেছ। আর চলবে না। এইবার তোমরা হবে সেবাদাস।'

'আমি এখনো শেষ করিনি ম্যাডাম। মেল কম্পিউটারের মেমারিতে কি কি থাকবে শোনো। ঠিক আটটায় ব্যাগ বগলে বাজারে ছোটা। ফিমেল কম্পিউটারের ঠিক আটটায় রান্না চাপানো। নটার সময় মেল কম্পিউটার পিঁক পিঁক করে সিগন্যাল দেবে। ফিমেল কম্পিউটার ঝটাপট খাবার দেবে—ভাত, ডাল, ভাজা, মাছ, চাটনি। এরপর ফিমেল কম্পিউটার নিজের মতো চলবে। কিন্তু, সেখানেও প্রোগ্রাম থাকবে। সময়ের বেহিসেবী খরচ চলবে না। ঘরদোর পরিষ্কার, ইন্টিরিয়ার ডেকরেশান, বিছানা পরিপাটি করা জামাকাপড় ওয়াশিং মেশিনে কাচা। ইস্তিরি করা। পর্দা পাল্টানো। ফুলদানির ফুল পরিবর্তন করা। ঝুলঝাড়া, ছবির কাঁচ পরিষ্কার করা। ফোন অ্যাটেন্ড করা। দরকারি খবর ডায়েরিতে লিখে রাখা। নিজের বান্ধবীকে ফোন করলে কম্পিউটারের টাইমার চালু রাখা। ঠিক এক মিনিট, তারপরেই পিঁপ। আর বান্ধবী যদি করে যতক্ষণ খুশি কথা বলে যাও। কম্পিউটারে এই প্রোগ্রামিংটা অবশ্যই যেন থাকে!'

'আর ফিমেল কম্পিউটার যদি চাকুরে হয়?'

'তাহলে তো হয়েই গেল, সে হয়ে গেল মেল কম্পিউটার। তখন আর ঘর সংসার রইল না। বাড়ি হয়ে গেল মেসবাড়ি। আমি যখন দাড়ি কামাব, তুমি তখন চুলের জট ছাড়াবে। বাড়িতে তালা। ছেলেপুলে হলে আয়া। কারুর ওপর কারুর থাকবে না মায়া।'

'তারপর কম্পিউটার যখন বুড়ো হবে!'

'বাতিল। আমেরিকায় যে-সব গাড়ি বুড়ো হয়ে যায় 'গো-ভাগাড়'-এর মতো 'গাড়ি-ভাগাড়ে' দূর করে টান মেরে ফেলে দেয়। তারপর বুলডোজার দিয়ে মড়-মড়িয়ে তালগোল পাকিয়ে গলিয়ে লোহা করে ফেলে।'

'আমরা তো লোহা নই।'

'দেহটা হাড়-মাসের, মনটা লোহার। তোমার মনে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা আছে?'

'না নেই।'

'তবে?'

'তোমার মনে আছে?'

প্রশান্ত বললে, 'টাকার মতো। নেই, তবু পেতে চাই। প্রেম নেই, কিন্তু চাই. পেতে চাই। জীবনে কেউ একজন থাকবে. কবিতার মতো, গানের মতো, আমার নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথা খোঁজে।'

“আর আমি যদি বলি, ‘তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে/আমায় শুধু ক্ষণেক তরে/আজি হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে/আমি সাঙ্গ করব পরে।।”

‘বুঝলে প্রমীলা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে বাঁচা যাবে না। শোনো, ‘অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া, সেইটুকুতেই জাগায় দখিণ হাওয়া।’

“তাহলে বলি, ‘আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি —/হায় বুঝি তার খবর পেলে না।’ এইবার ছোট্ট করে একটা কাজ করে দাও। বিরক্ত হয়ে না, প্রেমসে।’

‘লাগাও!’

‘খাটটাকে জানলার কাছ থেকে সরাতে হবে। বর্ষা এসে গেছে।’

‘তার মানে টানাটানি?’

‘কমরেড! সংসার মানেই যে টানাটানি! বাতাও ভাই, কেয়া হোগা! ক্যায়সে হোগা।’

বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশে সামান্য সামান্য নীলের উঁকি। প্রশান্ত ব্যাগ বগলে

রাস্তায়। বেশ চমৎকার লাগছে। জায়গায়, জায়গায় জল জমেছে। শৈশবটা ফিরে পেলে ওই জমা জলের ওপর দিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে অবশ্যই যেতে হত। না গিয়ে উপায় ছিল না। আকাশের উঁকি মারা নীলের মতো শৈশব, কৈশোর, যৌবনের টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে এসে ভেসে চলে গেল। তখন যারা ঘিরে ছিল, এখন তারা সব দূরে। বন্ধুরা জীবিকার সন্ধানে বেশির ভাগই বিদেশে। যারা দেশ ছাড়া হয়নি তারা সংসারী।

সংসার গিলে ফেলেছে। আত্মীয় স্বজনরা প্রায় সবাই আকাশে। মোড়ের মাথায় হরিদাস বাবুর বাড়ি। তিনি একসময় প্রশান্তর শিক্ষক ছিলেন। মারা গেছেন। খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ। এখনো সবাই তাঁর নাম করেন। বাড়ির সামনে ছোটখাট একটা ভিড়। ভেতরে কোলাহল। হরিদাসবাবুর দুই ছেলে তাদের বৃদ্ধা মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। প্রায় দরজার কাছ অবধি এনে ফেলেছে। বৃদ্ধা কাঁদছেন, আর বলছেন, 'মাকে ফেলে দিবি! আর ক'বছরই বা বাঁচব!' বড় ছেলে টানছে, ছোটটার হাতে একটা চটের ব্যাগ। ছোটর বউ অভিনেত্রী। বড়র বউ টেলিফোন অপারেটার। বড়র ব্যবসা। ছোটটা বউয়ের ম্যানেজার।

প্রশান্ত বললে, 'আপনারা দেখছেন, কিছু বলছেন না?'

উত্তর এল, 'পারিবারিক ব্যাপার। বাড়ির কাজের মেয়েটেয়ে হলে খাল খিঁচে দিতুম।'

বৃদ্ধার চোখে চশমা। ফ্রেমটা বহুকালের পুরনো। এক সময় টকটকে ফর্সা ছিলেন। এখন তামাটে। প্রশান্ত যখন ছাত্র, তখন উনি ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী। সেই সময় কত গল্প, গান, ইয়ারকি! ছোট ব্যাগটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ছোট বউ টকটক করে বাড়ি ঢুকছে। দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল। ব্যাগটা স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বৃদ্ধার শীর্ণ হাতটি ধরে বললে, 'কোথায়, কোথায় যাবেন আপনি? আমার কাছে থাকবেন। দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা। চলুন ভেতরে।' আমাদের
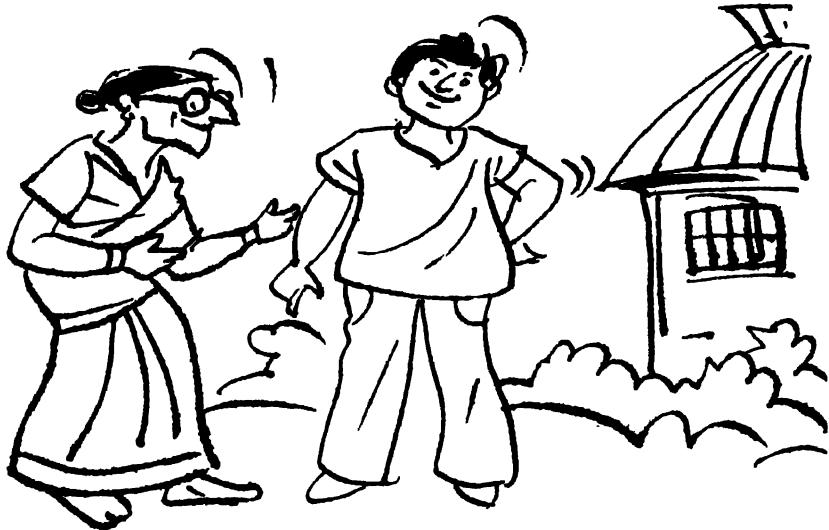
দিকে তাকিয়ে বললে, 'নাটক শেষ।' কোথা থেকে এক কিশোর এসে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'সত্যি। দিদি সত্যি! দিদাকে তুমি তুলে নিলে।' বলছে, আর কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে! প্রশান্ত ভাবছে এও সেই টানাটানি। মনে মনে মেয়েটিকে প্রণাম করে বার কয়েক উচ্চারণ করল, 'মা'।

ইচ্ছে করে

তোমার কী ইচ্ছে করে? এই প্রশ্নের কী উত্তর হবে? ধরা যাক ইচ্ছাপূরণের দেবতা এসে বলছেন— বল, গদাই, তোর ইচ্ছেটা কী! তোর বাসনা আমি পূর্ণ করব। সঙ্গে সঙ্গে আমার বউ এসে, কনুই মেরে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলবে 'থামো, থামো, চিরকালের মাথামোটা তুমি। তোমার বড় ভাই ভুজুং ভাজুং দিয়ে বাড়ির দোতলার দখল নিয়ে নিয়েছে। যে কেউ এসে নাকে কাঁদলেই তুমি দাতা কর্ণ। মুখচোরা, লাজুক, ভীতু, মাথামোটা, ম্যাদামারা টাইপের একটা লোক।'

আমার বউ হোঁত হোঁত করে সামনে এগিয়ে এল।

—আপনি ভগবান?

—লোকে তাই বলে। কী চাই বলো?

—এর আর বলাবলি কী আছে। প্রচুর টাকা চাই।

—তথাস্তু। তাই পাবে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

বাক্স, পেঁটরা, সিন্দুক, আলমারি, গুদাম, গুমটি, আটচালা, মাটচালা, প্যাকিংকেস, জুতোর খালি বাক্স, এমন কী ছাতের একপাশে অবহেলায় পড়ে থাকা ফুটো জলের ট্যাঙ্ক সব টাকায় টাকায় ভরে গেল।

এত টাকায় কী করা যায়!

বউ বললে, পাঁচ হাজার দামি দামি শাড়ি, ব্লাউজ আর পেটিকোট কিনবে। যতদিন বাঁচব আমরা কেবল ইলিশ আর চিংড়ি মাছ খাব। জলের বদলে ফলের রস। সব সময় জামদানি আর বালুচরি পরে থাকব। সিল্কের গামছা ব্যবহার করব। চটিতে ডায়মন্ড ফিট করব। বিশাল একটা 'প্যালেস' তৈরি করাব। চারপাশে এত বড় একটা বাগান, যে হেঁটে ঘোরা যাবে না, হাতির দাঁতের পালকিতে চেপে ঘুরব। কোনো সময়ে কোনো কাজ করতে হবে না। একশো কাজের লোক। হাত থেকে একটা সেফটি পিন পড়ে গেলেও নিচু হয়ে তুলব না। একজন এসে তুলে দেবে। যখন খবরের কাগজ পড়ব, তখন পাশে একজন বসে থাকবে, পাতা উলটে ভাঁজ করে দেবার জন্যে। বাতাসে খবরের কাগজের পাতা ওলটান যে কী ঝকমারি কাজ! গ্রীষ্মকালে সব ঘর মেশিন-ঠাণ্ডা, শীতকালে মেশিন-গরম। এমন একটা বিছানা তৈরি করাব, যা নৌকোর মতো দুলবে। বালিশে যন্ত্র ফিট করা থাকবে. মাথা রাখলেই অটোমেটিক

ঘুমপাড়ানি গান। ছেলে-মেয়েদের আর ওরে পড়, ওরে পড়, বলে মাথা খারাপ করার প্রয়োজন হবে না। তিন পুরুষ বসে বসে খাবে। লোক সপরিবারে পুরী যায় আমরা যাব সুইজারল্যান্ডে। বিস্কুট খাব, কেক খাব, চকোলেট খাব, চিজ খাব, আইসক্রিম খাব, ডজন ডজন সোনার ঘড়ি কিনব। তুমি কাঠের খড়ম পরে আলপ্সের বরফে স্কি করবে। আমি হিন্দি ছবির নায়িকার মতো চোখে 'গোগো গগলস' পরে মাউন্টেন টপ রেস্তোরাঁয় বসে রুপোর কাঠিতে গেঁথে গেঁথে স্ট্রবেরি খাবো, অ্যাভাকেডো খাব। ম্যাগাজিনে পড়েছি, চোখে দেখিনি কোনো দিন। হাজার শিশি ভীষণ দামি সেন্ট কিনব। এক ঝলক মাখলে এক মাইল এলাকা আমোদিত। চিমনি লাগান একটা কটেজ কিনব। প্লাস্টিক সার্জারি করে চামড়া টান টান করাব। যৌবনকে চিরস্থায়ী করে আষ্টেপৃষ্ঠে ভোগ করব। যা খাব তাই হজম হবে। গাঁটে গাঁটে বাতের ব্যাথায় যাতে বাবারে মারে করতে না হয়, সেই রকম একটা ব্যবস্থা করব। চুল যেন ভুসভুস করে না ওঠে, খুসকি যেন না হয়। জাপান থেকে নানা রকমের উইগস কিনে এনে এক একদিন

এক এক রকম হেয়ার স্টাইল করব। ঘরের মধ্যেই একটা সুইমিং পুল থাকবে। ছোট ছোট রাজহাঁস ভেসে বেড়াবে। ঠোঁটে করে সাবান এগিয়ে দেবে।

—রাজহাঁস ছোট পাবে কোথায়। সবই তো ধেড়ে ধেড়ে। বাজখাঁই প্যাঁক প্যাঁক।

—আরে ধুর্। পয়সায় কি না হয়। হাতি ছুঁচো হয়। বনসাই করা বট গাছ হয়, রাজহাঁসের বনসাই হবে না কেন? ঘরের মধ্যে চেপে বেড়াবার জন্যে অস্ট্রেলিয়া ছোট ছোট ঘোড়া তৈরি করেছে। বিলিতি ম্যাগাজিনে ছবি দেখেছি। জাপানিদের অর্ডার দিলে সব করে দিতে পারে। একজনের চাপার মতো ছোট্ট টুলের মাপের হেলিকপ্টার তৈরি করেছে। পাখা খুলে খাটের তলায় রাখা যায়। টুলটাকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বসে বসে মাংসে হেলুনি মারা যায়। বিজ্ঞানে কী না হয় বৎস। একটা মানুষের মতো আরো একশো, হাজার মানুষ তৈরি করা যায়। এর নাম 'ক্লোনিং'। আমি ভাবছি, আমার দশটা নকল তৈরি করাব। আমি শূন্য অবস্থা হতে দেবো না।

—অবিকল তোমার চেহারা!

—অবিকল।

—ওই রকম ভোঁতা নাক। লক্ষ্মী ট্যারা চোখ। পাঁউরুটির মতো ঠোঁট!

—এই দেখেই প্রেমে পড়েছিলে!

—হিপনোটাইজ করেছিলে। তিন বছরেই জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। তোমার নকলের স্বভাব-চরিত্রও কি ওই আসলটার মতোই হবে!

—অবশ্যই!

—ওইরকম, ঘরের পলস্তারা খসানো গলা!

—তোমাদের মতো বদ পুরুষদের দাবিয়ে রাখার জন্য এইরকম হাবিলদারের মতো গলারই দরকার। যেদিকে তাকাবে, যতদিন তাকাবে দেখবে আমি, শুনবে আমার গলা। আকাশে বাতাসে আমার সরব সগৌরব উপস্থিতি।

—খোলটা যাই থাক, ভেতরে প্রেমের স্বরটা খানিক বাড়ান যায় না, সেই বিয়ের আগে যেমন ছিল! মধুবাতা ঋতায়তে!

—আমেরিকান বিজ্ঞানী, যাদের দিয়ে করবে, তাদের জিজ্ঞেস করব। তবে, প্রেম মনে হয় দেহে থাকে না, বাইরের মাল। মাঝেমাঝে বেড়াতে আসে!

প্রিয় অপ্রিয়

ছটা ঋতু। মানুষের জীবন চক্রও ছয় ঋতুতে বাঁধা। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। চল্লিশের পরেই সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করবে। শীত আসবে। পাতা ঝরার কাল। দেহ আর মন দুটোই তখন ভাঙতে শুরু করবে। ঋতুর একটা চাকা আছে। শীতের পর বসন্ত। ঝরা পাতার পর সবুজ পাতা। মানুষের ঋতু একমুখী। যা যায় তা যায়। ফিরে আর আসে না। একটা একটা করে দিন খরচ করতে করতে সঞ্চিত দিনের মানিব্যাগ খালি।

এই ভয়ঙ্কর কথাটা আমরা কেউ মনে রাখি না। সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে গিয়ে সীতা হরণ হয়ে যায়। সামনে এসে দাঁড়ায় নাক কাটা সূর্পণখা। নিজের জীবনের বাহার দেখে নিজেরাই চমকে যাই। তখন মনে হয়, এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা, ভুল সবই ভুল। একটা পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে চালানর শিক্ষাই এই হাহাকারের কারণ। গোটা একটা শরীরের মালিক; কিন্তু ব্যবহার করলুম শুধু কড়ে আঙুল। মনের মাত্র একের চার অংশ কাজ করল, তিনের চার রইল ঘুমিয়ে।

জন্মালুম। জ্ঞান হল। স্কুল-পড়া-পরীক্ষা-পরীক্ষা-পরীক্ষা-ইন্টারভিউ-চেষ্টা-চেষ্টা-চাকরি-বিয়ে-সংসার-ছেলে-পুলে-অভাব-অনটন-রোগ-মৃত্যু-শোক-বার্ধক্য-জরদ্গব। একটা লোক এসেছিল— একটা লোক মরে গেল। 'মৃত্যুকালে তাহার বয়েস হয়েছিল এত, তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন'। ছেলের চাকরি হয়নি, মেয়ের বিয়ে বাকি। মাথার ওপর কেউ নেই। বাড়িওলা অনেকদিনই ঠোকরাচ্ছিল, এইবার ঘাড়ধাক্কা দেবে। সম্বল কয়েক হাজার টাকা, কয়েক ভরি গয়না। ছেলে জ্ঞান দিয়ে, জ্ঞান নিয়ে বেড়ায়। মেয়ে গান শেখায়। এরই নাম জীবন সংগ্রাম, সংগ্রামের জীবন।

এই ছকেই সব জীবন চলছে, চলবে। ব্যতিক্রম দশ শতাংশ ভাগ্যবান। মধ্যবিত্তদের মানসিকতা আত্মরক্ষামূলক। যেটুকু পেয়েছ সেইটুকুই সামলাও। বিশাল পৃথিবীটাকে ছোট্ট এতটুকু করে বারো বাই বারো ছোট্ট এতটুকু করে একটা খুপরির মধ্যে গুটিয়ে আনো। সেখানে জামকাঠের তক্তপোশে জরা আসার আগেই জরাগ্রস্ত পিতা খাবি খাচ্ছেন। সারাজীবন সংসার-খাঁচায় আবদ্ধ, সন্তানধারণ ও পালনে ক্লান্ত, পুষ্টিহীন মাতা যাবতীয় রোগাক্রান্ত। সেইখানে নীল মশারিতে যৌবনের অভিষেক। নবজাতকের হাত-পা ছোঁড়া। সেই প্রকোষ্ঠেই ঝনঝনে সকালের যবনিকা উত্তোলন। একই দিন,

একই রাতের সংক্রমণ। একই ধরনের স্বার্থসংঘাত। যেটুকু স্বপ্ন আসে সবই দুঃস্বপ্ন। দেয়াল ক্যালেন্ডারে হিমালয়। ছিন্নমলাট গীতাগ্রন্থে অপঠিত, জ্ঞান, ভক্তি, কর্মযোগের চিরকালীন আদর্শ।

এরাই বড়লোক, এরাই গরিবলোক। অ্যাসবেস্টাসের চালা, টালির চালাকে গরিব বলছে। টালির চালা টিভির অ্যান্টেনা আকাশে উঁচিয়ে বলছে, কী হে অ্যাসবেস্টাস, তোর আছে ছবির বাক্স। দেড়শো ফুটের সরকারি ফ্ল্যাট কিনে ভায়রাভাইকে উপদেশ ছুঁড়ছে, কী ভাই! এখনো একটা নিজের আস্তানা করতে পারলে না, হোপলেস! সারাটা জীবন কি করলে! সাইকেলকে টেক্কা মারে স্কুটার। যার মোটর হয়েছে, সে পাড়ার লোকের সঙ্গে অহঙ্কারে কথা বলে না। পাঞ্জাবিতে রসগোল্লার রস লেগে গেল। সবাই বলছে, ইস, দাগ লেগে গেল। পাঞ্জাবি শুনিয়ে দিলেন, 'কোন ভয় নেই, বাড়ি গিয়েই, সাঁই চি।'

—সাঁই চিটা কী ভাই।

—কিনে ফেলেছি একটা ওয়াশিং মেশিন। সব সময় ফিটফাট। পাঞ্জাবি ওয়াশিং মেশিনের গর্বে ঠিকরে বেরিয়ে গেলেন। মূহ্যমান বন্ধুপরিবার!

ওর হয়ে গেল, আমাদের হল না।

একেই বলে বাতাস লাগা। আসলে কারো কিছুই হল না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবাই হারার খেলাই খেলছে। আগে লাখোপাতির মাটিতে পা পড়ত না। এখন শয়েশয়ে কোটি টাকার মালিক। হজম করতে পারছে না। ভারতের লিভার খারাপ হয়ে গেছে। লিভার হল সরকার। সরকারের সিরোসিস। চতুর্দিকে বদহজম।

স্বামীজির ডায়াগনিসিসে আমরা কান দিলুম না।

ভারতবাসী কখনও ধনসম্পদের চেষ্টা করেনি। পৃথিবীর যে কোন জাতির চেয়ে বিপুলতর অর্থসম্পদের অধিকারী হয়েও ভারতবাসী কোনদিন অর্থের জন্য লালায়িত হয়নি। যুগযুগ ধরে ভারতবর্ষে এক শক্তিমান জাতি ছিল, কিন্তু তার কখনও ক্ষমতার লোভ ছিল না। অন্য জাতিকে জয় করার জন্য ভারতবাসী কখনও বাইরে যায়নি। নিজেদের সীমার মধ্যেই তারা সন্তুষ্ট ছিল, বাইরের সঙ্গে বিবাদ করেনি। ভারতীয় জাতি কখনও সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেনি। পরাক্রম ও সম্পদ এ-জাতির আদর্শ ছিল না।

বলেছিলেনঃ নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, আর চারদিকে বিস্তার করতে থাকো। উঠে পড়ে কাজে লাগো। নেতৃত্ব করার সময় সেবকভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও...।

কোথায় কী। ভারতীয় হাতি হতে গিয়ে বিদেশী ছুঁচো হয়ে যাচ্ছি।

শুয়েছিলে বাঁশি নিয়ে উঠলে ভেঁপু নিয়ে

সংসারটাকে ফর্মুলায় ফেল তো।

খুব সহজ। অঙ্ক দিয়ে সব কিছু এক্সপ্লেন করা যায়। অঙ্ক শব্দটাই একটা আবিষ্কার। বহু অর্থ তার। অঙ্ক মানে, চিহ্ন, রেখা, কলঙ্ক, রাশি, আঁক, সংখ্যা, গণনা, পরিমাণ, ক্রোড়, অর্থাৎ কোল, নাটকের পরিচ্ছেদ, বা বিভাগ আবার উদর অর্থাৎ পেট। ধরিত্রীর অঙ্কে আগমন, তারপর যাবতীয় অঙ্ক কষতে কষতে চিতার অঙ্কে শয়ন। অঙ্কই তো সব।

আচ্ছা, এইবার জীবনের অঙ্ক ঃ

ক + খ = গ, ঘ, ঙ

ক খকে বিয়ে করল, প্যাঁক পোঁক সানাই, ক্যাটারারের ফিশ রোল, বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহ, লড়ে যাও ক, লড়ে যাও ভাই। এই রেখে গেলুম যাবতীয় উপহার, শাড়ি, তোয়ালে, পমেটম, কথা বলা ঘড়ি, টেবিল ল্যাম্প, ইস্ত্রি। সম্পর্ক যখনই মনে হবে কোঁচকাচ্ছে— কোঁচকাবেই ভাই, স্ত্রী আর সিল্কে বিশেষ তফাৎ নেই, ব্যবহারে লাট খাবেই, সোহাগবারি সিঞ্চন করে আবেগের ইস্ত্রি চালিয়ে টান টান করে নিও। সংসারের জাতীয় সঙ্গীত কী জান!

তরী করে টলোমলো/পশেরাতে ওঠে জল (স্লো)

মাঝে মাঝে দুজনে একই দিকে বাইবে, প্রায়ই বিপরীত দিকে। ব্যবসার অংশীদার, রাজনীতির অংশীদার আর জীবনের অংশীদার, এদের কখনো মতের মিল হয় না। আইনসিদ্ধ লাগাতার ঠুসঠাসের নাম বিবাহ! There are few women so perfect that their husbands do not regret having married them at least once a day. রাসেল বললেন Marriage is the waste-paper basket of the emotions. আর একজন ভদ্রলোক ওয়াইলডার বললেন, The best part of married life is the fights. The rest is merely so-so. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ টুক করে এই সমরাঙ্গণে গীতাটি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন— তোমার সুখও নেই, দুঃখও নেই, জয়ও নেই, পরাজয়ও নেই। বৎস! তুমি একটি পেপার ওয়েট। কখনো সে ছুঁড়বে, কখনো তুমি ছুঁড়বে। আমাকে দেখ—কেউ আমাকে পিতা শ্রীকৃষ্ণ বলবে? না, আমি প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ। লীলা করেছি। কেন? প্রেমের মৃত্যুশয্যা হল ফুলশয্যা।

শুয়েছিলে বাঁশি নিয়ে উঠলে ভেঁপু নিয়ে। শেষে সিদ্ধান্তে এলে Marriage may be compared to a cage : the birds outside despair to get in and those within despair to get out (Montaigne)

শান্তির শ্রেষ্ঠ ফর্মুলা হল, শিবঠাকুরের ফর্মুলা। চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ো, নাচুক তাহাতে শ্যামা। মিটি মিটি তাকাও, স্পিকটি নট। পরিচিত এক দম্পতি চুক্তি করেছেন, আমি যখন বলব, তুমি তখন শুনবে, তুমি যখন বলবে, আমি তখন শুনব। দুজনে বলাবলি করব না। জৈন সাধুদের মুখে বাঁধা ফেট্টির মতো একটা ফেট্টি আছে তাঁদের, তার ওপর লেখা আছে— Either Peace or Piece, Piece. একজন শুরু করলেই আর একজন ছুটে এসে পটিটা মুখে, অর্থাৎ বাক্য নির্গমনের জায়গায় বেঁধে গুন গুন করতে থাকেন। এর নাম দিয়েছেন— পিস ব্যান্ড। আচ্ছা, এইবার ফর্মুলায় আসা যাক ঃ ক + খ = গ, ঘ, ঙ... [যে যেমন চায়] সন্তান, সন্ততি। এইবার, ক + খ - খ = ক। কণ্ড মাইনাস হতে পারে তখন ক। অতঃপর, ক - ক = 0 জিরোতে আসতেই হবে সব হিরোকে। স্বামীজি লিখলেন —শূন্যে শূন্য মিলাইল।

লেপ

বিনয় বিয়ে করে তিনটে বাঁশ পেয়েছে। একটা জ্যান্ত। সেটি হল তার বউ। অন্য দুটি হল ঘড়ি আর লেপ। আমার কথা নয়। স্বয়ং বিনয়ের স্বীকারোক্তি। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর বিনয় চুপচাপ ছিল। না খুশি, না অখুশি, একটা তূরীয় অবস্থা। যত দিন যাচ্ছে বিনয় নীরব থেকে সরব হয়ে এখন রবরবা। কথায় কথায় সংসারের কথা আসবেই। শুরু হবে বউকে দিয়ে। বউ থেকে সেই ভদ্রমহিলার জন্মদাতায়। সেখান থেকে ঘড়ি। ঘড়ি থেকে লেপ। ঘড়িটাকে বিদায় করেছে। কবজির কাছে ব্যান্ডের সাদামতো গোল দাগ এখনও রঙ ধরে মিলিয়ে আসেনি। মেলাবার মুখে। বউ চিরকালের জিনিস। ঘাড় থেকে নামাবার উপায় নেই, জিয়ার্ডিয়া অ্যামিবায়োসিসের মতো ক্রনিক কেস। সারা জীবন ভোগাবে। আর লেপ। শীতে নামাতেই হবে। নামালেই দুজনে গায়ে দেবে এবং পরের দিন সকালে আমাদের সেই লেপকেচ্ছা শুনতেই হবে।

বিবাহ মানেই একটি বউ এবং মনোরম একটি বিছানা। বিছানা ছাড়া ফুলশয্যা হবে কি করে! বিনয় শীতকালে বিয়ে করেছিল বলে একটি লেপও পেয়েছিল। ডবল মাপ। দুটি প্রাণীর শীতের আশ্রয়। লাল শালুর খোলে শিমুল তুলো। এর মধ্যে সমস্যার কি আছে সরল বুদ্ধিতে বুঝে ওঠা শক্ত। কিন্তু সমস্যা অনেক।

প্রেম যখন ঘনীভূত ছিল তখন সমস্যা ছিল না। আলো নিবিয়ে লেপের তলায় ঢুকে দুজনে জড়াজড়ি করে 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই' গোছের ব্যাপার। এখন এতদিন পরে অপ্রেমে সেই 'কমন' লেপকে গালাগাল দিলে আমারা শুনব কেন? তবু শুনতে হয়। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হলে সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে 'পারে, কিন্তু কথায় কথায় একটা আস্ত লেপকে তো দুটুকরো করা যায় না। কাপড়ও নয় যে জোড়া কেটে দুটো করবে। বউ আর লেপ অবিচ্ছেদ্য। দাম্পত্য প্রেম আবার অবিচ্ছেদ্য নয়। সেখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে। এই গলায় গলায়, এই চুলোচুলি। তেঁতুল যত পুরোন হয় ততই টক বাড়ে। লেপের ঝগড়া, ঝগড়ার লেপ। লেপের দুই মূর্তি। বউয়ের মতোই। এই মনোরম, পরমুহূর্তেই বিস্ময়। সামলানো দায়।

প্রেমে মানুষ ত্যাগী হয়। বিনয় যখন প্রেমিক ছিল (বছর খানক মাত্র) তখন শীতে বউকে লেপের তিনের চার 'অংশ ছেড়ে দিয়ে নিজে একের চার অংশে হিহি করত। ছেড়ে দিত বললে ভুল হবে। বউ কেড়ে নিত। প্রথম রাতে লেপের তলায় দুটি মানুষ হলেও প্রেমে তালগোল পাকিয়ে একাকার। তখন আর সমস্যা কি? সমস্যা

মাঝরাতে। বিনয়ের আদরে আদুরী বউ উঁমুমু করে পাশ ফিরলেন, লেপের তিনের চার অংশ তার সঙ্গে চলে গেল। বিনয়ের শরীরের আধখানা খোলা, উদোম পড়ে রইল পৌষের শীতে শীতল সাদা চাদরে। পা দুটোকে জড়ো করে স্ত্রীর জোড়া ঠ্যাঙে গুঁজে গরম করতে গেলেই ঘুমের ঘোরে খ্যাঁক করে ওঠে, হচ্ছে কি? এবার ঘুমোও। লেপের বাইরে হায়নার মতো মাঝরাতের গাছ-গাছালির শিশির-মাখা শীত হামা দিচ্ছে। বিনয় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পশ্চাদ্দেশটিকে লেপের অংশে ঠেলে দিয়ে ভাবতে থাকে— ঘুমাও, হ্যাঁ এখন ঘুমাও কবি, রাতের কবিতা শেষ। জীবনটা যেন রঙমহলের অভিনয়। প্রেমের নাটকে যবনিকা পড়ে গেছে। নায়িকা পাশ ফিরে লেপের আরামে শুয়ে শুয়ে নায়ককে বলছে, দৃশ্য শেষ, মনের মেকআপ তুলে ফেলেছি। তখন তোমাকে সহ্য করেছি, কারণ করতেই হবে। তোমাকে বিশেষ অঙ্কের বিশেষ দৃশ্যে সহ্য করাই আমার জীবিকা। আমার জীবনের দুটো দিক, একটা অভিনয়ের দিক আর একটা নিজস্ব দিক। শীতের নির্জনতায় মানুষের মনে স্যাঁতসেঁতে চিন্তাই আসে। মনমরা চিন্তা সব হিলহিল করে ওঠে। পায়ের পাতা দুটোই বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওই জন্যেই বলে শীত করে। করে মানে, হাতে। শীত পায়। পায় মানে পায়ে, পদে। পা দুটো আশ্রয় খুঁজেছিল। পদাঘাতে ফিরিয়ে দিলে। একটা হাত বুকের উষ্ণতায় গরম হতে চেয়েছিল, খুব বিরক্ত হয়ে বললে, মাঝরাতে কি ইয়ার্কি হচ্ছে! সাবাশ বেটা। ঘুমোলে মানুষের মনের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। বউ বলে আমিই এক বুরবাক, হেদিয়ে মরি। আসলে তুমি শ্বশুরমশাইয়ের কন্যা। পাকা বাঁশ কি সহজে নোয় রে বাবা!

সামান্য লেপ থেকে বিনয়ের অভিমান বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় উঠল যেখানে বিনয় যৌবনে যোগিনী। কার বউ? কিসের সংসার? বউও শ্বশুরমশাইয়ের, লেপটাও তাঁর। যাও তোমার লেপ তুমিই নিয়ে শুয়ে থাক। বিনয়ের শুধরে দেবার কেউ নেই। শ্বশুরমশাইয়ের বউ কি রে? ওই হল আর কি।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে লেপ সরে যেতেই পারে, তা নিয়ে অত মান-অভিমানের কি আছে বাপ। তুমিও টেনে নাও না। এ তো পাক-ভারত লড়াই নয় যে বাউন্ডারি কমিশন বসিয়ে সীমানা ঠিক করে দিতে হবে। বিনয় বললে, বউকে নিজের মনে করতে পারলে সে অধিকার অবশ্যই খাটাতুম।

এ আবার কি কথা! বউ নিজের নয় তো কি পরের?

বিনয়ের উত্তর শুনে ঠান্ডা মেরে যেতে হয়। চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন। চব্বিশ ঘন্টায় দশ ঘন্টা নিদ্রা। বাকি রইল চৌদ্দ ঘন্টা। চৌদ্দ ঘন্টার চার ঘন্টা চান, খাওয়া, এটা ওটা। বাকি দশ ঘন্টার সবটাই বিনয়ের খরচ করতে হয় জীবিকার সংগ্রামে। ব ভাল হিসেব। তাহলে বউয়ের সঙ্গে এত ঠোকাঠুকি, মান অভিমানের সময় আসে কাথা থেকে। তুমি শ্রীকৃষ্ণ নও, তোমার বউ রাধিকা ঠাকরুণও নন যে সারাদিন দমতলায় বসে মানভঞ্জন পালা গাইবে। আধুনিক মানুষ তুমি, খাবে-দাবে, ছোটাছুটি

করবে, কেরিয়ার গুছোবে, তা না দিবারাত্র বউ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান, লেপ নয়ে লাঠালাঠি। এইসব পান্‌সে সমস্যা আমরা শুনতে চাই না। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সমস্যা আছে যা নিয়ে মাথা ঘামালে দেশের উপকার হবে।

বিনয় তখনকার মতো চুপ করলেও আবার সরব হয়ে ওঠে। লেপের যে এত মহিমা কে জানত। বিনয় ক্রমশ দার্শনিক হয়ে উঠছে। বিনয়ের মতে, বউ পরের ঘর থেকে আসে আসুক, তার সঙ্গে খাট, বিছানা, বালিশ আর সাটিনে মোড়া একটি লেপ যেন না আসে। খাল কেটে কুমির এনেছ এই যথেষ্ট, সেই সামলাতেই তোমার হাড়ে দুব্বো গজাবে, সঙ্গে আর কয়েকটা ফালতু লেজুড় এনে ন্যাজে গোবরে হওয়াটা ডবল মুখ্যুমি। পরের সোনা দিও না কানে, কান যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে। হীনম্মন্যতায় ভুগবে। একই কক্ষপথে দুটো গ্রহ যদি বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে প্রথমেই যা হবে তা হল দমাস করে একটি সংঘর্ষ। তারপর দুটোতে গায়ে পা লাগিয়ে ঠেলাঠেলি। তারপর যার শক্তি বেশি সেই-ঘোরাতে থাকবে নাকে দড়ি দিয়ে চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো। সংসারে স্ত্রী জাতিই প্রবলা। প্রবলা হবার কারণ পুরুষ জাতির দুর্বলতা। আমার মানু, মানু আমার করে ফার্স্ট ইয়ারে যে সোহাগ করেছিলে সেই সোহাগের পথে তোমার পার্সোনালিটি লিক করে বেরিয়ে গেছে। ফলে সেকেন্ড ইয়ার থেকেই তুমি ক্রীতদাস। ট্যাঁক নবজাতক, ঘাড়ে সিংহজাতক।

সিংহজাতক মানে?

শ্বশুরমশাইয়ের নাম নরেন সিংহ। এটা ট্যাঁ করে তো ওটা গর্জন করে। দুজনেরই সমান সমান বায়না। বায়না না মিটলেই এর ক্রন্দন, ওর আস্ফালন, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আমার ধোপা নাপিত বন্ধ। পিরিতের তাসের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। প্রেম যে কত ঠুনকো তা বিয়ে না করলে বোঝে কার বাপের সাধ্য।

প্রেম ঠুনকো হোক ক্ষতি নেই। তুমিও প্রেমের বয়স পেরিয়ে এসেছ। এখন তুমি পিতা এবং স্বামী। সেই ভাবে বুঝে-সুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার করে যাও। ঘ্যানর ঘ্যানর করে লাভ কি? শাস্ত্র বলছে, 'দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' এই ভাব, এই ঝগড়া। সংসারে জীবন-নৌকো চলবে ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে। উঠবে পড়বে। পড়বে উঠবে।

উপদেশ দেওয়া সহজ। পড়তে আমার মতো অবস্থায়, ঠ্যালার নাম বাবাজীবন শুনবে কি জিনিস! তখনও গা থেকে গায়েহলুদের রঙ ওঠেনি, পাওনা শাড়ির মাড় ওঠেনি, লেপের তলা থেকে বলে উঠলেন, বাবা একটা লেপ দিয়েছে বটে, পালকের মত হালকা, উনুনের মত গরম। নজর দেখেছ?

ও তোমার যৌবনের উত্তাপ। তায় আবার পান খেয়েছ কাঁচা সুপুরি দিয়ে। লেপের আবার ভাল মন্দ কি! সে এক সালু কি সাটিন, ভেতরে তুলো। সব লেপেই যা থাকে এর মধ্যেও সেই একই মাল।

রাখো! বরের লেপে শ্মশানের তুলো ভরে দেয়, বুঝলে চাঁদু?

শ্মশানের তুলো? সে আবার কি।

কি জানো তুমি। শ্মশানের যত মড়া আসে তাদের বিছানা ছিঁড়ে তুলো বের করে তুলোপট্টিতে জলের দরে বিক্রি হয়। সেই তুলো দিয়ে তৈরি হয় ফুলশয্যার লেপ। এ জিনিস সে জিনিস নয়। এ হল এক নম্বর মাল। আগুন ছুটছে।

তোমার পিতাঠাকুর কি চৈত্র মাসে শিমুল গাছের তলায় গিয়ে হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়েছিলেন? পাকা তুলো ফাটছে আর তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে ধরছেন, খোলে পুরছেন। আহা, এ মণিহার আমার নাহি..। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ। ফ্যাঁসোর ফোঁসোর। তুমি আমার বাবাকে শিমুলতলায় দাঁড় করালে, এরপর কোন দিন বাবলা গাছে চড়াবে। অনেক সাধ্যসাধনা করে শেষে রাত তিনটের সময় দেহি পদপল্লবমুদারম্ আওড়াতে আওড়াতে স্বামীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ভোরবেলা শুকনো মুখে, বসা চোখে কাকের ডাক শুনতে শুনতে মনে মনে বললুম, ইহা লেপ নহে, যীশুখ্রীষ্টের মৃতদেহের সেই আচ্ছাদন।

শ্বশুরবাড়ির জিনিস সম্পর্কে সব মেয়েরই ওই রকমের এক ধরনের দুর্বলতা থাকে। বউ বস্তুটিকে ব্যবহার করার কায়দা আছে ভাই। মোলায়েম মোলায়েম হাতে ময়দা ডলার মত ময়াম দিয়ে মাখতে হয়, তবেই না খাসা মুচমুচে লুচি।

তা হলে শোন। সেই লেপপর্ব কোথাকার জলকে কোথায় নিয়ে গেছে। লেপের

তলায় ঢুকে একদিন পা দুটোকে বেশ একটু খেলাচ্ছি। সিংহকন্যা বললে, হঠাৎ আবার দেয়লা শুরু করলে কেন? সাতজন্মে পা ঘষ না। তোমার ওই চাষাড়ে পায়ের ঘষা লেগে লেপের ছাল উঠে যাবে।

কথাটা কিছু অসত্য বলেনি হে। তোমার পায়ের যা মাপ আর তার যা চেহারা। অনেকটা এবমিনেবল স্নোম্যানের মত।

পুরুষের পা এই রকমই হয়। পদাঘাতের পা। আঘাতের লোক তো আর পেলুম না, পদাঘাত খেয়েই গেলুম। আমার বরাতে নিউমোনিয়ায় মৃত্যুই লেখা আছে।

কেন?

কেন আবার! এই শীতে রোজ রাতে বিছানায় ওঠার আগে কনকনে ঠাণ্ডা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে লেডি ইন্সপেক্টার জেনারেলকে দেখিয়ে অনুমতি নিয়ে বিছানায় উঠতে হবে। তারপর শুনবে, আরও শুনবে বিনয়ের বিনীত কাহিনী। পেঁয়াজ কি রসুন কাঁচা খাওয়া চলবে না। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে লেপের ভেতরের হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। মুলো খাওয়া চলবে না। পেট গরম হতে পারে। গরম পেটঅলা লোক নিয়ে কমন লেপে শোয়া যায় না। রোজ টক দই খেতে হবে। ঠান্ডা জলে সাবান মেখে চান করতে হবে। শরীরের সন্ধিতে সন্ধিতে ছোবড়া ঘষতে হবে। নিম্নবাহুতে গোলাপের নির্যাস মাখতে হবে। পরিষ্কার ধবধবে পাজামা আর গেঞ্জি পরতে হবে। কারণ লেপের তলায় চাই কলগেট নিশ্বাস, বাগিচার সুগন্ধ। লেপের তলায় নেড়িকুকুর নিয়ে কোন ফ্যাশানেব্‌ল মহিলা শুতে পারেন না। লোমঅলা, ধবধবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাউডার মাখা বিলিতি কুকুর চাই। মাথায় তেল মেখে কলুর বলদ হওয়া চলবে না। তেলচিটে বালিশ, তার ওপর সাটিনের লেপ, ম্যাগো, ভাবা যায় না! এবম্বিধ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তোমরাই বল।

বউকে পারবে না, লেপটাকেই ডিভোর্স কর। সিংহশাবককে বল, খুব হয়েছে মা জননী, তুমি থাক মহাসুখে লেপের তলায়, আমি থাকি আমার মতো, কাঁথার তলায়। শীতকালে প্যাঁজ না, রসুন না, মুলো না, মাথায় তেল নয়। মামার বাড়ি আর কি! রোজ চান? এমন অনেকে আছেন যাঁরা শরতে শেষ চান করেন, শীত পার করে ফাল্গুনের হোলিতে রঙিন হয়ে আবার চানপর্ব শুরু করেন। তোমার যদি হাঁপানির ব্যামো থাকত, তোমার বউ কি করতেন— তালাক দিতেন?

আরও একটা দুঃখের কথা বলি ভাই, ফুলকপি আমার ভীষণ প্রিয়। সারাবছর অপেক্ষায় থাকি, শীত এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব বলে। সেই কপি খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। কপি বায়ুকারক। আমার স্ত্রী বলে, লেপের যোগ্য হবার চেষ্টা কর। যা তা মাল লেপে সিঁধোলে পলিউশান হবে!

মার শালা তোর শ্বশুরবাড়ির লেপে এক লাথি।

তাই তো মেরেছি। আগে আগে হত কি, সন্ধেবেলাই হিসেব নিয়ে বসতুম। অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতে বউকে অর্থনীতির উপদেশ দিতে ইচ্ছে হত। আয় বুঝে ব্যয় করতে শেখ! কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। তেলটাকে সেই তিন কিলোতেই তুললে। কয়লা দু মণেই তাহলে পাকা হয়ে গেল! রোজ এক কেজি আলু লাগবেই! পাঁচ কেজি মুগের ডাল? লম্বে হাত। মাসে গায়েমাখা সাবান পাঁচটা? বহুত আচ্ছা। ঠুস ঠাস, ঠুস ঠাস করতে করতে পর্বত ধূমাৎ বহ্নিমান। এবার থেকে তুমিই তাহলে রাঁধ। শীতকালে তেল একটু বেশিই খাবে।

না, খাবে বললেই খাবে। একটু টানতে শেখ, কেবল ছাড়তেই শিখেছ।

আমার বাপের বাড়িতে এত টানাটানি ছিল না। হাঘরের মত সংসার আমি করতে পারব না।

ডোন্ট ফরগেট, দিস ইজ নট ইওর বাপের বাড়ি। শ্বশুরের তেল বেচা পয়সা আহ্লাদী মেয়ে দুহাতে উড়িয়েছেন। দীয়তাং ভুজ্যতামের কাল চলে গেছে। ব্যস, সিংহী অমন ফুঁসে উঠে তাঁর চাল চালতে লাগলেন। রাতে অনশন। শয্যাত্যাগ। ভূতলে শয়ন। সাধ্যসাধনায় তিনি ভূতল ছেড়ে শয্যাতলে এলেন। ঘাড়ে লেপ চড়ানা হল। রাগ পড়ল না। স্বামী সাংঘাতিক হলেও একটি প্রাণী। মশা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর, আরও রমণীরক্ত লোভী এবং ঝাঁক ঝাঁক। মশার আক্রমণে লেপাশ্রিতা হলেও সন্ধি হয় না। একই লেপের তলায় দুই রাগী। লেপের গরম, রাগের গরম, ঘেমে মরি। তখন ছিল একদিন ঝগড়া তো পরের দিন ভাব। তিরিশ দিনের পনেরো দিন স্বামী-স্ত্রী আর পনেরো দিন ছোটলোকের বাচ্চা আর ছোটলোকের বেটি। পাশ ফিরে শুয়ে হাপর টানে। পশ্চাদ্দেশে পশ্চাদ্দেশে ঠেকলেও জ্বলে জ্বলে ওঠা, ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া। বাঘ কিংবা বিষধর সাপ নিয়ে শুয়ে থাকা।

সে তো ভালই। দাম্পত্যকলহের পর প্রেম আরও জমে ওঠে। মেঘলার পর রোদ, রোদের পর মেঘলা, কনট্রাস্ট না হলে খেলা তেমন জমে না ভাই। ঠিক রাস্তাতেই চলেছ গুরু। ঠাকুর বলতেন, রসেবশে রাখিস মা।

হ্যাঁ ভাই, তা ঠিক। সেই রস এখন জমে মিছরির ছুরি হয়ে যেতেও কাটছে আসতেও কাটছে। গত একমাস বাক্যালাপ বন্ধ। আঠারো কেজি চিনির দাম নিদেন একশো আশি টাকা। বেশি মিষ্টি করেই মিষ্টির কথা বলতে গেলুম। একশো আশি টাকার চিনি খেলে আমি যে চিতেয় উঠব ভাই। উত্তর হল, মায়ের পেটগরমের ধাত, রোজ সরবত খেতে হয়। মেয়ে হয়ে কিছুই করব না, তা তো হয় না। তুমি আর মায়ের মর্ম কি বুঝবে বল। ছেলেবেলাতেই খেয়ে বসে আছ। মা ছিল বলেই না আমাকে পেয়েছ।

আহা মাতৃভক্ত মাতঙ্গিনী, স্বামীকে চিতায় চাপিয়ে মায়ের দেনা শোধ! কথাটা

মুখ ফসকে বেরোনমাত্রই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। কাপ ডিশ ভেঙে, দেরাজের আয়না চুরমার করে, বইয়ের র‍্যাক ভেঙে আধুনিক রাজনীতির কায়দায় অ্যায়সা প্রতিবাদ জানালে তিনদিন হাঁড়ি চড়ল না। দফতর চালু হলেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। আমি বউবাজার থেকে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড লিখিয়ে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম—রাগ চণ্ডাল। তার তলায় লিখেছি— চণ্ডালের হাতে পড়েছি। তোরা আমাকে একটা লেপ কিনে দে ভাই, ডিসেম্বরের শীতে কেঁপে মরছি।

কেন সেই লেপটা?

ভাই বিছানায় পার্টিসান উঠেছে। একটা রাত শুধু লেপ বয়ে কেটেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। কেঁপে কেঁপে ঘুম আসছে, এসে গেছে, ঝপাৎ করে গায়ে ভারি মত কি একটা পড়ল। আচমকা। ভেবেছিলুম বউ হয়তো অনুশোচনায় ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ল। ক'দিন চালাবে বাবা কোল্ড ওয়ার। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা চলে কি? ওঠ ওঠ! কেন ওরকম কর? বলেই মনে হল, আরে বউ তো আরও একটু শক্ত হবে, লম্বামত হবে। এতো দেখছি অনেকটা জায়গা নিয়ে চৌকো মত কি একটা এসে পড়েছে। বউ নয়, লেপ। কি হল লেপটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে? উত্তরে মিনি গর্জন শোনা গেল, হুঁ।

তোমার বাবার লেপ তুমি নিয়েই শোও। আমার ঘাড়ে কেন?

লেপ তোমার।

হ্যাঁ, লেপ আমার। তা ঠিক। বউ আর লেপ দুটোই আমার ছিল। আসলটা হাত ছাড়া, ফাউ জড়িয়ে মাঝরাত্রে মটকা মেরে পড়ে থাকি। এ যেন সেই গ্যারেজে গাড়ি রেখে বাবুর বাসে ঝোলা। লেপটা দু হাতে তুলে ঝপাং করে সিংহকন্যার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এলুম। সারারাত লেপ নিয়ে পিংপং। তোরা ভাই আজ আমাকে একটা লেপ কিনে দে।

বেডিং স্টোরে গিয়ে আমাদের লেপ দেখা শুরু হল। দেখি একটা হাল্কা সিঙ্গল লেপ। বিনয় বললে, সিঙ্গল নয় ডবল।

ডবল কি করবি? সিঙ্গল মানুষ।

না, ডবল কিনব। এতকাল শীতের রাতে বউয়ের লেপের তলায় নেড়িকুকুরের মত আশ্রয় খুঁজেছি। এইবার নিজের লেপে বুক চিতিয়ে পাশে একটু জায়গা রেখে শুয়ে থাকব। দেখি তুমি আস কি না তোমার অহঙ্কারের দরজা খুলে।

ভূমিকা

কত রকমের চোখ আছে? হরিণের মতো, পেঁচার মতো, গরুর মতো, শেয়ালের মতো। মনুষ্যেতর প্রাণীর চোখের সঙ্গে বুদ্ধিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চোখের উপমা। আবার উদ্ভিদ জগতের দুটি বস্তুর সঙ্গেও উপমিত হয়, যেমন, পটলচেরা চোখ, আলুচেরা চোখ। সুন্দরীদের দখলে হরিণ এবং পটল। হরিণ নয়না। পটলচেরা চোখে বিপাশা যখন তাকায় ভূমিকম্পের মতো হৃদয়কম্প 'সম্রাটের শিথিল হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল, তিনি বহুমূল্য পারস্যের গালিচার উপর দিয়ে চতুষ্পদ প্রাণীর মতো হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন! সুন্দরী, দেহি পদপল্লবমুদারম্। তাঁহার ওইরূপ করুণ পরিণতি দেখিয়া তাঁহার কুকুর শূন্য মশনদে আরোহন করিয়া সরোষে চিৎকার জুড়িল। সভাসদবর্গ ছুটিয়া আসিলেন। সম্রাটের প্রেম দেখিতে পাইলেন না।' এই সভাসদদের কারো চোখ পেঁচার মতো, কারো চোখ ধূর্ত শেয়ালের মতো, কারো গরুর মতো।

চোখ খুলে দেখা। কি দেখা? চারপাশে যা-ঘটছে, সেই সব ঘটনা দেখা। প্রকৃতি দেখা। জীব জগৎ দেখা। পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের দেখা। চোখ দেখায়। মন তার ব্যাখ্যা করায়। মন বিচার করে। এক একজনের মন এক এক রকম। সেই কারণে একই ঘটনা, একই দৃশ্যের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম।

একটি সুন্দর গল্প আছে। মাঠের মাঝখানে একটা মাটির ঢিবি। পাশে পড়ে আছে পায়েচলা পথ। রাত বারোটা নাগাদ সেই পথে প্রথমে একজন মাতাল এল। সে অন্ধকারে ওই ঢিবিটাকে দেখে ভাবলে, তারই মতো এক মাতাল। সে ঢিবিটাকে বলল—বাঃ ভাই! তোমার নেশা ধরে গেল, আর আমি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছু পরেই এল এক চোর। সে ঢিবিটাকে দেখে বললে, বাঃ ভাই! আমি এখনো বাড়িই খুঁজে পেলুম না, আর তুমি বসে বসে বাক্স ভাঙছ! তারপরেই মাঠের ওই পথে এলেন এক সাধু! তিনি ঢিবিটাকে দেখে বললেন, সাবাশ ভাই! তোমার ধ্যান লেগে গেল, আর আমি এখনো বসতেই পারলুম না! যার যেমন মন তার তেমন দর্শন! বাবা দেখেছেন স্ত্রী, সন্তান দেখছে মা। একজন প্রকৃতি প্রেমী শালের জঙ্গলে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা। ঋজু ঋজু গাছ সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ আর আকাশ। ঈশ্বরের শিল্প প্রতিভা, কবির কবিতা। দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এক বেদান্তবাদী সাধু এসেছিলেন। তিনি মেঘ দেখে নাচতেন, ঝড়বৃষ্টিতে খুব আনন্দ। হিমালয়ে এক সাধু ছিলেন। গুহাবাসী। দিনে একবার গুহার বাইরে এসে

পাহাড়, ঝরনা দেখতেন আর আনন্দে নাচতেন— এ কেয়া বানায়া! তাঁর কাছে একটা আয়নার কাঁচ ছিল। সেইটি তিনি নদী, পাহাড়, তুষার, ঝরনার দিকে ফিরিয়ে বলতেন, দেখো দেখো। আবার ওই শালের জঙ্গলে কাঠের কারবারি কি দেখবেন? টন টন কাঠ। লাখ লাখ টাকা।

বাঘ হরিণ দেখে কবিতা লেখে না। তীর বেগে ছুটে গিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরে। তার পৃথিবী সুন্দরের পৃথিবী নয়, মাংসের পৃথিবী। ক্ষুধার পৃথিবী। আবার শিকারীর পৃথিবী হল বুলেটের পৃথিবী। খুনীর পৃথিবী ছুরির পৃথিবী। সার্জনের পৃথিবী অপারেশান টেব্‌লের। রাশি রাশি টিউমার, আলসার, অ্যাপেনডিক্স। ইটে বসে নবকুমার চামড়ায় ক্ষুর ঘষছে। তার পৃথিবী হল, গাল, দাড়ি, মাথা, চুল। ধরো আর নামাও। পকেটমারের পৃথিবীতে শুধুই পকেট। মানুষ নয়, অজস্র পকেট আর সাইড ব্যাগে। একজন নেতার চোখে পৃথিবীটা হল ভোট আর ভোটারের। ভোট ব্যাঙ্ক। রাজনীতির প্রোফেশনাল বক্তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বক্তৃতা দেন—বন্ধুগণ! বিছানায় চিৎ, মাঝরাত, গভীর ঘুমে, সেই অবস্থাতেই মাঝে-মাঝে ডিঙ্গি মেরে উঠছেন, ইন কিলাব। স্ত্রী ভুঁড়িতে চাপ মেরে দেহকে সমতল করতে করতে বলছে, 'ও গো! এ তোমার কেলাব নয়, বাড়ি বাড়ি!'

চোখ হল ক্যামেরা। প্রতি মুহূর্তে ছবি তুলে পেছনের পর্দায় ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে উলট ছবি সোজা হচ্ছে। সাইকেল চেপে পিন্টু যাচ্ছে। মস্তিষ্কের অন্য সমস্ত কোষ থেকে একবারে খবর বা 'ডাটা' আসতে লাগল, সে সব চোখের দেখার তথ্যের বাইরে। কিন্তু সেই সব তথ্য যুক্ত হয়ে পিন্টুর চেহারা বদলাচ্ছে। খুব উদ্যোগী। সঙ্গে সঙ্গে দেহটা ঋজু হয়ে গেল। মেধাবী। চোখের দেখা পিন্টুর চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল হল, নাকটা হয়ে গেল ধারাল। নিরহঙ্কারী, আলাপী। মুখে ফুটে উঠল অতি সুন্দর হাসির ঝলক। মস্তিষ্কের অদৃশ্য কোণ থেকে ক্ষরিত হল ভালবাসা, আহা! পিন্টুর মতো ছেলেতে দেশটা যদি ভরে যেত!

একটু পরেই সাইকেল রিকশা চেপে রমা চলে গেল। কোলের ওপর লেডিজ
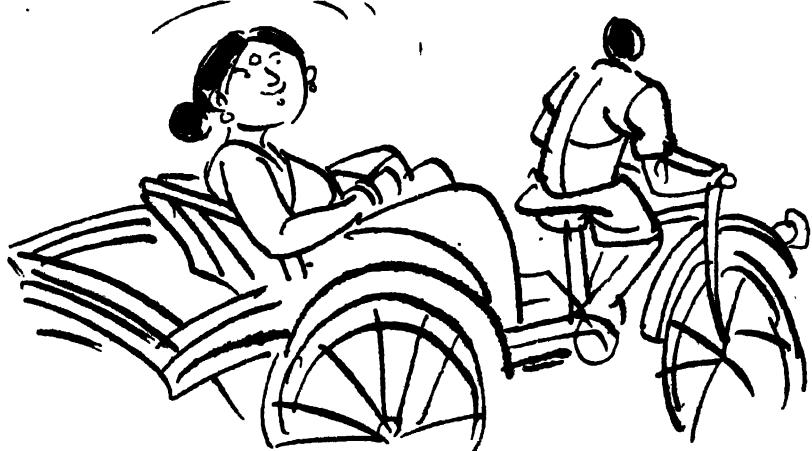
ব্যাগ। তার ফিতেটা দু-হাটুর মাঝখান দিয়ে সামনে ঝুলে আছে। পেনসিল দিয়ে ভুঁরু এঁকেছে। ঠোটে একটু লিপস্টিক চার্জ করেছে। শাড়িটা দামি। আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এই ছবির একটি সিদ্ধান্তই হত—সুন্দরী। মনোলোভা। কিন্তু এই ছবির পেছনে বসে আছে আমার সুক্ষ্ম মন। আহত মন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী রমা রূপান্তরিত হল রাক্ষসী রমায়। সেজে গুজে সাইকেল রিকশা চেপে কে গেল, এক পেতনী।

বিকাশ আমার বন্ধু। যত দিন আমার স্তরে ছিল ততদিন মনে হত, এমন বন্ধু আর হয় না। এমন একজনের জন্যে পৃথিবীতে বারে বারে আসা যায়। কলেজ শেষ করে আমি গেলুম চাকরিতে, বিকাশ গেল ব্যবসায়। কয়েক বছরের মধ্যে বড়লোক। বিকাশ বদলে গেল কিনা জানি না। আমি বদলে গেলুম। আমার দেখা, আর সেই দর্শনের ব্যাখ্যা অন্যরকম হয়ে গেল। বিকাশ এখন বেশ মোটা! সঙ্গে সঙ্গে মন সাপ্লাই করলে, হবেই তো! বোতলে ঘটোৎকচই তৈরি হয়। বিকাশ আগেও হা হা করে হাসত। এখনও সেই ভাবেই হাসে। আমার মন বলে, দুনম্বরী টাকা থাকলে মানুষ ওই ভাবে 'যাত্রার' হাসি হাসে। কেউ বিকাশের প্রশংসা করলে আমি জ্বলে যাই। কারণ একটাই। বিকাশ পেরেছে আমি পারিনি। আমি পারিনি বলেই বিকাশের পারাটাকে ঘৃণার চোখে দেখেছি।

কত রকমের চোখ তাহলে আছে? প্রেমের চোখ, ঘৃণার চোখ, জ্ঞানের চোখ, লোভের চোখ, রাগের চোখ, কামের চোখ, অসহায়ের চোখ, আনন্দের চোখ, আত্মবিশ্বাসীর চোখ, খুনীর চোখ, আক্রান্তের চোখ, ভক্তের চোখ, যোগীর চোখ। একশ চোখের কত ভাষা!

সবার ওপরে সন্দেহের চোখ। আমরা বাস করছি সন্দেহের যুগে। কেউ কারো মতলব বুঝতে পারছে না। প্রত্যেকের মনে অনুচ্চারিত প্রশ্ন, 'কি মতলব!'

১। 'অনেক দিন পরে মনে হল যাই একবার দেখে আসি তোমরা সব কে কেমন আছ?'
'কি মতলব?' (মনে মনে)

২। 'আমি আমার এত বছরের জীবনে অনেক মানুষ দেখলাম, তোমার মতো একজনকেও দেখলুম না।'
'কি মতলব?' (মনে মনে)

৩। 'কি কেমন আছেন? সব ভাল ত! বউদি? সুগারের কি খবর?'
'সুগার রেশানের বাইরে। খোলা বাজারে মিলবে। বউদির বা...।'
'না না আপনার সুগার, বাজারের সুগার নয়।'
'আমার শরীরে সুগার নেই, সবই বিটার। কি চাই বলো তো!'
'ছেলেটা অনেকদিন বসে আছে, যা হয় একটা চাকরি করে দিন না!'

ঐই চিড়িয়াখানায়

দুনিয়াটা ভগবানের চিড়িয়াখানা। সবাই শুনেছি। আগেও শুনেছি, পরেও শুনব। প্রশ্ন হল, ভগবান কে? মহা ঐশ্বর্যশালী কেউ একজন। চৌরঙ্গী কী আলিপুরে কয়েক কাঠা জমির ওপর যার একটা বাড়ি আছে, সে তো সাংঘাতিক বড়লোক। গেটে উর্দিপরা দারোয়ান। ভেতরে তিনটে অ্যালসেশিয়ান। দোলায় দোল খাচ্ছে বোম্বাইমার্কা ফুলুফুলু মেয়ে। গোটা দশ বারো মানুষের সঙ্গে তার ওঠাবসা। সারাদিন চাঁদির চাকতির ধান্দা। রাতে সায়েবদের ফেলে যাওয়া ক্লাবে পানভোজন। মধ্যরাতে ব্যারেল হয়ে বাড়ি ফেরা।

তাহলে? ভগবানের ঐশ্বর্যটা ভাবা যায়! সারা পৃথিবীতে ক বিঘে জমি আছে? হিসেব করে দেখেছে কেউ। গোটা ভূমণ্ডলের মালিক। সূর্য তাঁর, চন্দ্র তাঁর, এক আকাশ তারা। সাতটা সমুদ্রের মালিক। এভারেস্ট তাঁর, মঁ ব্লাঁ তাঁর। চারপাঁচটা বালিভরা বিশাল মরুভূমি। আবার কত বড় দাতা! নিঃশর্তে সব দান করে দিয়েছেন মানুষকে।

ভগবান যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন না, মন্দিরে মন্দিরে মূর্তি হয়ে বসে আছেন, তার একটা অর্থ বোঝা যায়। অতবড় একজন মানুষ, তাঁর সমকক্ষ না হলে মেশেন কী করে। রাজা রাজার সঙ্গেই খানা খাবেন। মাঝে মধ্যে সময়ের অনেক অনেক ব্যবধানে, তাঁর প্রতিনিধি অবতার হয়ে আসেন। কেউ আসেন জ্ঞান নিয়ে, কেউ আসেন প্রেম নিয়ে। কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করার ব্যর্থ চেষ্টায় কেউ কঙ্কাল সার বুদ্ধ, কেউ দুহাত তুলে নাচতে নাচতে, প্রেম বিলোতে বিলোতে, জগাই মাধাইয়ের ছোঁড়া কলসির কাণা উপেক্ষা করে সোজা সমুদ্রে বিলীন। কেউ ঝুলে গেলেন ক্রুশে, চিরকালের সিম্বল। মানুষের ভালো করতে চেয়েছ, কি মরেছ!

ভগবানের অন্যসব জন্তুজানোয়ারদের স্বভাব চরিত্র খুবই সহজ সরল। বোকা ছাগল মানুষের পেটে যাবে। বোকা পাঁঠার গায়ে মোটকা গন্ধ। সুযোগ পেলেই গুঁতোতে আসবে। রাম ছাগলের দার্শনিকের মতো চোখ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি হতে পারত, যদি একটু কষ্ট করে সেলুনে যেতে পারত। তার জীবনের একটাই দর্শন— পাতা, শালপাতা, কাগজ, কাপড় যা পাবে, মুখে পুরে আধবোজা চোখে সারাদিন চিবিয়ে যাও। ছাগল মাংস হবে, দামি জুতোর চামড়া হবে।

ভেড়া আবার পরোপকারী। মাংস তো দান করবেই। গায়ের লোম দান করে ভগবানের দেওয়া শীত থেকে মানুষকে উষ্ণতা দিয়ে আরাম দেবে। ফুটপাথের মানুষকে নয়, হর্ম্যতলের হরেকরকম মানুষকে। আর একটি শৌখিন জিনিসও ভেড়া মানুষকে দেয়, নিজে যতই ভেড়া হোক না কেন? সেটি হল উলফ্যাট, অন্যনাম ল্যানোলিন। দামি ফেসক্রিমে ল্যানোলিন থাকে, সোজা সুন্দরীদের গোলাপী গালে। এটাও জানা আছে, রাগী ভেড়া স্ট্রেট লাইনে ছুটে এসে এমন ঢুঁ মারতে পারে, মরে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এ ছাড়া ভেড়ার আর কোনো ইজ্জত নেই।

বাঘের একটা সৌন্দর্য আছে ঠিকই; কিন্তু নিজের কোনো সৌন্দর্য বোধ নেই। সুন্দরী হরিণ দেখলেই হল। ঝোপঝাড় ভেঙে মাইলের পর মাইল দৌড়। ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে। সামান্যমাত্র কবিত্ব নেই। আহা! অমন চোখ, এত সুন্দর চামড়া! তাতে কী, কড়মড় চিবোও। বাঘের যত আধ্যাত্মিকতা সব তার ছালে। মহাদেব পরে আজও ঘুরছেন। বাঘছালে না বসলে তান্ত্রিকের কুলকুণ্ডলিনী জাগবেই না। তার কুণ্ডলিনী শক্তি না জাগলে ভগবানের দরবারে যাওয়াই যাবে না। বাঘ হল জঙ্গলের রাজা। বিউটি।

সিংহ একেবারে অন্যরকমের। মাথার দিকটা অবশ্যই বিউটিফুল। কেশর ফেসর নিয়ে যেন মহাকবি। দেহের নিচের দিকটা বিশ্রী। সিংহ বাঘের মতো অত খাবো খাবো করে না। কখন কী করে জানাই যায় না। একা থাকতে ভালোবাসে। তা ছাড়া সিংহের সম্মান বাড়িয়েছেন দেবী দুর্গা। সিংহ যদি পিঠ পেতে না দিত, মা দুর্গার ডান পাটা থাকত কোথায়। আবার অসুর। মরবে জেনেও এমন ভদ্রতা, বুক পেতে দিয়েছে যাতে মা বাঁ পাটা রাখতে পারেন, টালখেয়ে পড়ে না যান, ঘট-মট, চালচিত্র ফালচিত্র নিয়ে হুড়মাড় করে। মায়েরও ছিরি কী, ওটা একটা যুদ্ধের পোজ হল! একে তো নিজে হ্যাণ্ডিক্যাপড়। দশটা হাতের ঠেলায় হিমসিম অবস্থা। হাত আর অস্ত্রশস্ত্রের জট ছাড়াবেন না যুদ্ধ করবেন। অসুর শুধু দয়াপরবশ হয়ে এবং মায়ের অমন রূপে কিছুটা কামমোহিত হয়ে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুক চিতিয়ে মায়ের পদতলে— নাও মা, তোমার টিনের তৈরি বরশার খোঁচায় আমাকে ফিনিশ করে দাও। অতঃপর পৃথিবীতে যা হবে, তার ইন্ট্রোডাকসান, ভূমিকাটা হয়ে যাক। নারীর সঙ্গে সংগ্রামে পুরুষ কোনোদিন জয়ী হতে পারবে না। পুরুষ জাতির এই নিয়তি।

সিংহ দেবীর বাহন। তার একটা আলাদা সম্মান জীবজগতে। মা দুর্গার সঙ্গে সিংহেরও পূজা হয়। গণেশের সঙ্গে গণেশের ইঁদুরের, মা লক্ষ্মীর সঙ্গে প্যাঁচার, কার্ত্তিকের সঙ্গে ময়ূরের, মা সরস্বতীর সঙ্গে হাঁসের।
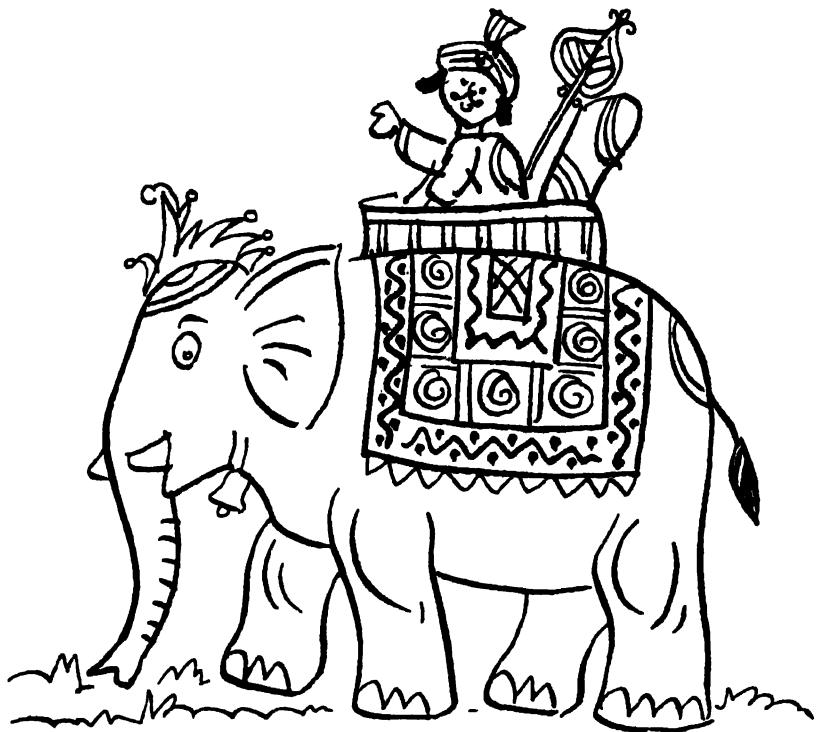
ভগবানের চিড়িয়াখানায় হাতি এক বিশাল ব্যাপার। কয়েক টন ওজন। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চে গোটা একটা কলাবাগান শেষ। রাজা, মহারাজাদের বাহন হত একসময়। যুদ্ধেও যেত। উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে হাতিতে হাওদা চড়িয়ে শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে সাদা আর বাদামি শিকারিরা বাঘ শিকারে যেতেন। চেনবাঁধা হাতিও ছিল। মানুষ অত বড়, অত শক্তিশালী প্রাণীকেও দাস বানাতে পারত! মাহুতের কোড ওয়ার্ডে হাতি ওঠবোস করত। হাতি আবার রূপালি পর্দার নায়ক অথবা নায়িকা। হাতি মেরা সাথী, সফেদ হাতি। হাতির মধ্যে একটা মানুষ মানুষ ব্যাপার আছে। রেগে গেলে ভয়ঙ্কর। পোষ মানাতে পারলে শান্ত শিষ্ট এক পালোয়ান। মানুষের গজদন্ত সৌন্দর্যের বিড়ম্বনা. হাতির দাঁত ঐশ্বর্য। এই দাঁতের কারণে কত হাতি যে মারা পড়েছে মানুষের হাতে! শুনেছি, হাতির স্মৃতিশক্তি খুব জোরাল। ভীষণ মনে রাখতে পারে। যে ভালবাসে তার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। যে অনাদর করবে তার জন্যে মৃত্যু। সুযোগ পেলেই মারবে। গণেশ ঠাকুরের সেই কারণেই অঙ্কের মাথা অত ভাল। মারোয়াড়িদের গদিঘরের কুলুঙ্গিতে, কুলুঙ্গিতে তিনি বসে আছেন। জ্বলছে লাল টুনি। ভ্রাম্যমান ওড়িষি পুরোহিতরা বিড় বিড় করে পুজো করে যান। ছ্যাটাং ছ্যাটাং গঙ্গাজলের ছিটে। ওইটুকুতেই, কোটি কোটি টাকা। গণেশ, এমনই দেবতা, উলটে

গেলেও লাভ। এক নম্বরেও গণেশ, দু নম্বরেও গণেশ। সাদাতেও গণেশ লালেতেও গণেশ। আর্টিস্ট আর স্কাল্পটাররা গণেশকে ধরেছেন। নানা ধরনের ছবি আর মূর্তি। ছাতা মাথায় গণেশ। তবলা বাদক গণেশ। বই পড়ছেন গণেশ। গণেশ বেচেই কিছু মানুষ বড়লোক।

ভগবানের আর এক সৃষ্টি ঘোড়া। আদি যুগে বলিষ্ঠ মানুষের দ্রুতগামী বলিষ্ঠ বাহন। বেশ একটা আভিজাত্য আছে। ঘোড়ার মতো মুখ হলেও লেজের বাহার অসম্ভব। মেয়েরা কায়দা করে চুল বেঁধে বলে, পনিটেল। ভালই দেখায়। ঘোড়ার ত্বকও খুব সুন্দর। কোনোটার রঙ চেস্ট নাট, কোনোটার ব্রাউন। সাদা ঘোড়া তো স্বপ্ন। সেকালের যুদ্ধে অপরিহার্য ছিল। একালের যুদ্ধেও কম যায় না। সব দেশের আর্মিতেই ক্যাভালরি আছে। তবে আলাদা শিভ্যালরি। ইংরেজ আমলে রাজা-মহারাজারা ঘোড়ার পিঠে চেপে পোলো খেলতেন। অলিম্পিকে হর্সরাইডিং একটা আইটেম। আমাদের পুলিসে এখনো ঘোড়া আছে, মাউন্টেড পুলিস, আমরা ছেলেবেলায় ভুল উচ্চারণে বলতুম, মাউন্টেন পুলিস।

টেক্সাসের কাউবয়রা কাউতে চাপে না। সব ঘোড়ার ব্যবসা করে। অষ্ট্রেলিয়া ঘোড়ার জন্যে বিখ্যাত। এক একটা ঘোড়ার দাম মানুষের দামের চেয়ে বেশি। একালের নতুন রাজারা রেসের ঘোড়া তৈরি করেন। ভীষণ তার দাম। এক একজনের নাম কী! সিলভার ওক, ব্লু লিলি। রেসের বইয়ে এইসব নাম লেখা থাকে, সঙ্গে পেডিগ্রি। বাপ ঠাকুরদার নাম। কে কোন রেস জিতেছে। মুম্বাই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালার, কলকাতা, রেসের মাঠে ছুটছে ঘোড়া। কে মারবে ডারবি! গ্যালারিতে স্ট্যান্ডে যাঁরা বাজি ধরেছেন, তাঁদের লম্ফঝম্প। ডারবি জেতা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দরী মালিক। ছবি তোলা হচ্ছে। ঘোড়া হাসলেও বোঝার উপায় নেই। সুন্দরীর মুখে বিজয়িনীর হাসি। জকিদেরও অসামান্য খাতির। সেলিব্রিটি। হাওয়ায় উড়েউড়ে গিয়ে দেশ বিদেশে ঘোড়া ছোটায়। ওই ঘোড়াদের জগৎটা যত সহজ এই ঘোড়াদের জগৎটা তত সহজ নয়। ভেতরে টাকার খেলা, বাইরে টাকার খেলা।

কুরুক্ষেত্রে ঘোড়া, তৈমুর, চেঙ্গিজের ঘোড়া, শিবাজির ঘোড়া, রাণা প্রতাপের ঘোড়া, ঘোড়া এক সেলিব্রিটি। হরেক সব নাম, চৈতক, রৈবতক ইত্যাদি। গীতার মলাটে রথের ছবি। দুটো তাগড়াই সাদা ঘোড়া। গাণ্ডীবধারী পার্থ। লাগাম ধরে আছেন পার্থসখা শ্রীকৃষ্ণ। ছবি দেখে ভক্তের চোখে প্রেমাশ্রু। দেবী দুর্গা কখনো আসেন ঘোটকে, কখনো হাতিতে, কখনো পালকিতে, কখনো নৌকোয়। আসা আর যাওয়া ভিন্ন ভিন্ন বাহনে। বাহন অনুসারে রাষ্ট্রফল। গজ সদা শুভ, অশ্ব সদা অশুভ। ঘোড়া যোদ্ধা হওয়ায় মনে হয় বদনাম। খরা, দেশ ছত্রভঙ্গ, এই সব বলা হয়। আবার নারীর দেহলক্ষণে হস্তিনী শব্দটা ভাল নয়।

পেঁচা মা লক্ষ্মীর বাহন। সে পেঁচা অবশ্যই সাদা, দুধু দুধু চেহারা, ডাগর ডুগুর নধরকান্তি। ঐশ্বর্যের প্রতীক। মাঝরাতে ঘরের ছাতে ওই পেঁচা এসে বসলে গৃহস্থের ভাগ্য খুলে যেতে বাধ্য। কালো পেঁচা বা কাল পেঁচার কদর নেই।

বাদুড়ও নিশাচর: কিন্তু বাদুড়ের সঙ্গে মানুষের সুস্থ জগতের সম্পর্ক নেই। ড্রাকুলা, ভ্যাম্পায়ার, ভাঙা বাড়ি, যাদুকর, ডাইনি, মরণ, মারণ, উচাটন, মৃত্যু, এই সবের যোগ। ভিটায় চামচিকি, মানে হয়ে গেছে। কেউ নেই। মৃত্যু, মালা মকদ্দমায় শুভদিন হাওয়া। বিগ্রহশূন্য মন্দিরে চামচিকির বাসা।

ঘুঘু অত সুন্দর পাখি, তবু বলা হবে, ভিটের ঘুঘু চরাব। একমাত্র এক ইংরেজ কবি, প্রেমিকার বুকের সঙ্গে ঘুঘুর নরম বুকের তুলনা করেছেন।

পায়রা অহরহ বেড়ালের পেটে গেলেও শান্তির প্রতীক। আবার ডাকহরকরা।
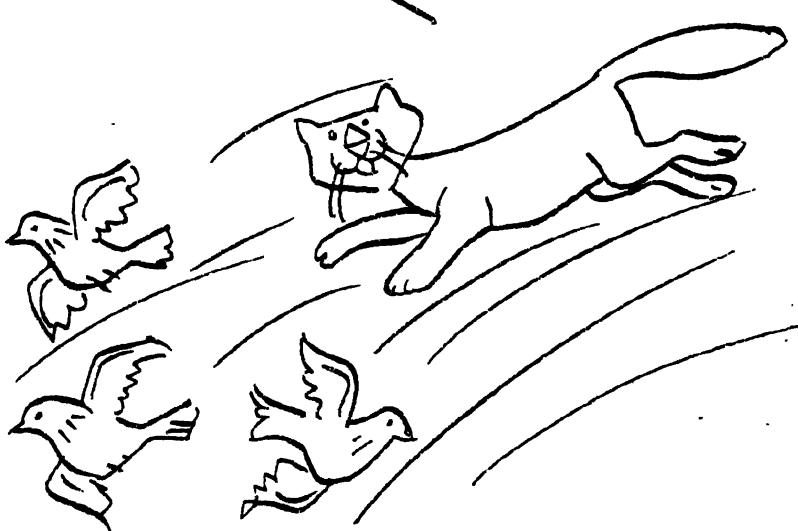
একালের কোরিয়ার সার্ভিস আসার ঢের আগেই পায়রাকে কোরিয়ার হিসেবে মানুষ কাজে লাগিয়েছে। বন্দী রাজকন্যার চিঠি নিয়ে দেশান্তরে উড়ে গেল পায়রা। রাজকুমার আসবে উদ্ধারে। গুপ্তচররাও পায়রার সাহায্যে খবর পাচার করত। আবার পায়রাকে গুলি করে আকাশ থেকে নামিয়ে গুপ্তচরের হদিশ করে গুলি।

ভগবানের চিড়িয়াখানায় উট এক অসাধারণ প্রাণী। মাইলের পর মাইল রোদে পোড়া বালি। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই, জল নেই। যে ঈশ্বর মরুভূমি তৈরি করেছেন, তাঁর পক্ষেই উট তৈরি করা সম্ভব। শিপ অফ দি ডেজার্ট। খাদ্য হল কাঁটা গাছ। দু কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে, ভ্রুক্ষেপ নেই। আর তার জলের আধার পিঠেই আছে, সেটি হল তার কুঁজ। মরূদ্যান পেলেই জল ভরে নেবে নিজের কুঁজে। উত্তপ্ত মরুভূমি।

ালিয়াড়ি ঢেউ তুলেছে। সীমাহীন অনন্ত প্রান্তর। উটের কাফেলা চলেছে। পিঠে সাদা আচকান পরা বেদুইন। দৃশ্যটা চলচ্চিত্রেই ভাল। মরুভূমি বালির কবিতা, ভীষণ রোমান্টিক। ভয়ঙ্কর সুন্দর।

জিরাফ এক আজব প্রাণী। একালের মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মতো এতখানি একটা লম্বা গলা। মুখটা এতটুকু ছুঁচোর মতো। গাছের সর্বোচ্চ ডাল থেকে অক্লেশে পাতা খেতে পারে মশমশ করে। পেছন দিকে চাঁট মারায় ওস্তাদ। লম্বা গলা উঁচিয়ে দলে দলে যখন দৌড়োয় মনে হয় কলকাতার রাস্তায় মিছিল ছুটছে পার্টির ব্যানার উঁচিয়ে।

নতজানু ক্যাঙারু আর এক বিচিত্র সৃষ্টি। পেটের কাছে পকেট। সেই পকেটে বাচ্চা। বসে বসেই চলে। একটা খরগোসকে সার দিয়ে বাড়াতে পারলেই ক্যাঙারু।

সবচেয়ে দুঃখের প্রাণী গরু। মানুষ গোমাতা, ভগবতী এই সব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে দুইছে আর খাচ্ছে। দুধ, ক্ষীর, সর, ননী, ছানা, সন্দেশ, ঘি মাখন। খাচ্ছে আর ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। কেউ কেউ বলে, ভাই, দুধ আমার একেবারেই সহ্য হয় না, তাই, হয় ছানা, না হয় ক্ষীর খাই। রাবড়িটাও সহ্য হয়। গাভীর মুক্তি নেই, বলদের অবস্থা আরো কাহিল। একমাত্র মুক্ত পুরুষ ষাঁড়। বিরাট বপু নিয়ে ঘুরে বেড়াও, যেখানে যা পাও টেনেটুনে খাও, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে গুঁতোগুঁতি করে প্রমাণ কর শিবঠাকুরের বাহন।

বাঁদর আর মানুষ প্রায় একই রকম দুঃখি। রামচরিত মানসে তুলসিদাসজি বাঁদরের মুখ দিয়ে এই দুঃখের কথা প্রকাশ করেছেন। এক বেদে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে নাচ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, বাঁদর নাচ। বাঁদর তখন দুঃখ করে বলছে,

কুদকে সাগর উতারা, কোহি কিয়া মিং।
কোহি ওখ্‌রা গিরি দরখৎ, কোহি শিখায়া নীৎ।।
ক্যা কসুঙ্গা সীতানাথ কো, মেয়নে কিয়া চোরি।
সোহি কুল উদ্ভব রো, বেদিয়া খিঁচে ডোরি।।

"অতীতে এই বানরবংশে জন্মে কেউ একলাফে দুস্পার সাগর টপকেছে, কোনো কোনো বানর বীরকুল শ্রেষ্ঠ রঘুপতির বন্ধু হয়ে জগৎখ্যাত, কেউ ভুজবলে বৃক্ষ, গিরি উৎপাটন করেছে, কোনো কোনো বানর অসাধারণ নীতিবিশারদ হয়ে জগজ্জনকে নীতিশিক্ষা দিয়েছে; কিন্তু আমি সীতাপতি রঘুবরকে প্রশ্ন করছি, আমি কি কিছু চুরি করেছিলাম, তা না হলে ওই বংশে জন্মে আমার এই হাল কেন প্রভু! এক বেদে আমার গলায় দড়ি বেঁধে মানুষের দোরে দোরে আমাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ভগবানের এই চিড়িয়াখানায় আমাদেরও ওই একই প্রশ্ন—মানুষ থেকে মানুষ গেল কোথায়! বাঘের মতো মানুষ, সিংহের মতো মানুষ, পরমহংসের মতো মানুষ! যে সব শেয়াল!

বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট

একটা ইংরেজি বইয়ের নাম, 'বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট'। বাংলা করলে দাঁড়াবে সৌন্দর্য এবং পাশবিকতা। অথবা সুন্দরী এবং পশু। আবার এমনও হতে পারে, সুন্দর কিন্তু পশু। দেখতে কত সুন্দর কিন্তু এ কি আচরণ! পশুর মতো! যে মানেই কর যাক, এই পৃথিবীতে অমৃত আর গরলের সহাবস্থান। আর প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ বোধ সুস্পষ্ট, সুন্দর অসুন্দর, দেবতা ও দানব, মানব এবং পাশব। আর এক পরম বিস্ময়! জীবনানন্দ থেকে কটি লাইন ধার করা যেতে পারে, যেখানে এ বিস্ময়ের সুন্দর প্রকাশ : দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস/সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর/নিষ্পেষিত মনুষ্যতার/আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহা নীলাকাশ...//

বাঘ নিঃসন্দেহে সুন্দর প্রাণী। তার গায়ের জামাটার দামই কয়েক লক্ষ টাকা এখন পয়সা ফেললেও পাওয়া যাবে না। আইন বড় কড়া। সংরক্ষিত প্রাণী জেল। এই সুন্দর প্রাণীটিকে জাপটে ধরে আদর করতে চাইলেও করা যাবে না সার্কাসের আফিংখোর বাঘকে সার্কাস সুন্দরী পেটের দায়ে চুমুটুমু খায় বটে, তবে সে এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। ভয়ংকর দুর্গন্ধ!

বাঘের মাসি সুন্দরী কোনো বেড়ালকে পোষ মানিয়ে শয্যাসঙ্গী করা যায় বটে তবে একশোভাগ নিরাপদ নয়। বেশী চটকালে আঁচড়ে দিতে পারে। তা ছাড়া নানাবি রোগসংক্রমণের সম্ভাবনা। আর একটা ভয়ংকর দুঃখের কথা, পশুজগতে সুন্দর, কারণ অনেক সাধ্য সাধনা করে রমণীর মনোহরণ করতে হয়। ফলে বাঘে মাসি নয় অনুসন্ধান করতে হবে সুন্দর একটি হুলো—বাঘের মেসোমশাই।

সুন্দর অসুন্দর জ্ঞানটা একমাত্র মানুষেরই সম্পদ। মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে এ নেই। সেখানে তিনটি প্রবণতাই প্রবল, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। সে জগতে কোনো সুন্দরী বাঘিনী সুন্দর কোনো হরিণকে প্রেমপত্র লিখবে না। চাঁদের আলোয়, বনভূমিতে তা চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করবে না, বুকফাটা প্রেমের গান গাইবে না। দেখা মাত্র শুরু হয়ে যাবে মাইলের পর মাইল জীবনমরণ দৌড়। অবশেষে সেই দীঘল সুগঠি গলাটাই কামড়ে ধরে ঝুলবে, তবে সেটি প্রেমের দংশন, 'লাভবাইট' নয়, মরণ হরিণের অত সুন্দর চিতল আবরণ ফর্দাফাঁই করে আগ্রাসী ভোজন। এতটুকু নেই যে অত সুন্দর একটা চামড়া নষ্ট করছি রাক্ষুসে খিদের কারণে। মানুষ সেদি

থেকে বুঝদার প্রাণী অবশ্যই। হরিণ মারাটাকে ব্যবসার দিকে নিয়ে যাবে, যাতে 'কোট'টা না নষ্ট হয়। শিং, অক্ষত চামড়া আর মাংস তিনদামে তিন কিস্তি বিক্রি। বোকা জমিদারদের পোড়ো প্রাসাদের দেয়ালে শতাব্দী-প্রাচীন বিবর্ণ শিং, দেখা যাবে বেঁকে ঝুলে আছে ঝুলের বুনোটে, যেন মৃত্যুরও মৃত্যু। মানুষ ক্রৌঞ্চ বধ করলে মানুষের মধ্যেই কোনো ব্যাধ মুহূর্তে কবি হয়ে যেতে পারেন,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।।
কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণীরে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!
ঘোর অন্ধকারমাঝে, এ কী জ্যোতিভায়—
অবাক্! করুণা এ কার।।

(বাল্মীকি প্রতিভা ঃ রবীন্দ্রনাথ)

মানুষের মধ্যেই একমাত্র এই দ্বিমুখীতা। কখনো শয়তান, কখনো ভগবান। কখনো দস্যু আবার প্রেমিক কখনো। রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল দানব প্রযুক্তির কাল। মানুষ আর মেশিনে তফাৎ সামান্যই। যন্ত্র প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মাদি করে না, শব্দ ছাড়া কোনো স্বর নেই, আনন্দ-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি প্রকাশ্যে নেই অপ্রকাশ্যে আছে, পরীক্ষা করে সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। চিমটি কাটলে লোহারও লাগে। অপ্রকাশ্য অনুভূতির কথা বাদ দিলে যন্ত্র যন্ত্রই। নির্দেশ পালনই তার কাজ। সর্বাধুনিক মানুষও অনুরূপ এক বোধশূন্য প্রাণী। মল মূত্র ত্যাগ ছাড়া কোনো পার্থক্য আছে কী! যন্ত্র কাজ করতে, করতে কোনো দিন বলবে না, একস্‌কিউজ মি. টয়েলেটে যাচ্ছি। যন্ত্র চালক যেতে পারেন এবং যাবেন। কারখানার মালিকের কাছে সেই কারণে কোটি টাকার যন্ত্রের খাতির সর্বাধিক। মানুষের অস্তিত্বের এই অবমাননা যত বাড়ছে, মানুষের নির্বোধ উন্মাদনাও তত বাড়ছে। দেবতা হওয়ার চেষ্টা ছেড়ে আরো আরো আরো দানব হওয়ার সাধনা। সভ্য ব্যাধের বাদামি হরিণ শিকারের চিত্রটি এই রকম, বনপ্রান্তে ভোর ফুটছে। 'আকাশের রঙ ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীলঃ চারদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ'।

এই অরণ্যে কবিও তো রয়েছেন। তাঁর চোখে শেষ রাতের শেষ বিদায়ী তারাটি চোখে পড়েছে আর কি অপূর্ব উপমা! 'একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছেঃ পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো।'

সারাটা রাত বনভূমিতে কি ঘটে গেছে। 'হিমের রাতে শরীর 'উম' রাখবার জন্যে দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে। মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন। শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের।' রোদ আলো পড়েছে। ভোরের তরুণ রবি। তার ফলে, 'সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর,....সকালের আলোয় টলটলে শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।'

কী মনে হচ্ছে? পৃথিবীটা ভারি সুন্দর না! 'বিউটি, বিউটি'। আর এক কবি বললেন তো-'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' হতাশা, জীবন যন্ত্রণায় একটি মাত্র গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন শিল্পী। জীবৎকালে সাধারণ মানুষ তাঁকে উন্মাদ বলেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর একটি ছবি সংগ্রহে রাখার জন্যে পৃথিবীর রাজারা একশো কোটি টাকা ঢালতেও প্রস্তুত। সেই ভ্যানগগ, তাঁর ভাই থিওকে অজস্র চিঠি লিখেছিলেন। এই নিঃসঙ্গ, খ্যাতি বঞ্চিত, প্রতিভাবান ভাইটিকে থিও-র মতো কেউ ভালবাসেনি। পৃথিবীর ভ্রাতৃপ্রেমের ইতিহাসে একটি হীরকখণ্ড। ভিনসেন্ট পৃথিবীর সৌন্দর্যে উন্মাদ এক শিল্পী। পৃথিবী! আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসার দৃষ্টিতে অসুন্দরের উপস্থিতি নেই। প্রেম এমন এক দান, যে কৃপায় তুমি আমার চিরসুন্দর, আমি তোমার চিরসুন্দরী। ভালবাসি তাই গাই গান, কবিতা লিখি, ছবি আঁকি। সুন্দরী পৃথিবীকে কে না ভালবাসতে চায়! ভিনসেন্ট লিখছেন, ভাই প্রতিটি দিনই সুন্দর দিন, সে আবহাওয়া যেমনই হোক। বুঝলে, খুব ঝোড়ো বাতাস। তা হোক, আমি মাটিতে দুটো খোঁটা পুতে ইজেলটাকে বেঁধে দি। ছবি না আঁকলে চলবে! বাগিচা সব ফুলে ফুলে ভরে গেছে। লাঙল টানা মাঠে লাইলাকের রঙ, নলখগড়ার বেড়া, দুটো পিচ ফলের গাছ গোলাপি রঙের; আর আকাশটা! বিউটি, বিউটি! উজ্জ্বল, উজ্জ্বল, অতি উজ্জ্বল নীল আর ছিটে ছিটে সাদা মেঘ। শোনো ভাই, এই সুন্দর পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কিছু নেই।

O never think the dead are dead:
So long as there are men alive
The dead will live, the dead will live

কিন্তু আমাদের কবির দেখা যে একটু অন্যরকম, সেখানে সারারাত মৃত্যু তাড়া করে ফেরে জীবন। 'সারারাত চিতা বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে. নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।'

তারপর! কবি এ যেন এক রূপকথা। যা আছে। সেখানে আমরা নেই, তাই রূপকথা। তারপর! তারপর!

'এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে; কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে,' তারপর!

'নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল---ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেশ দেওয়ার জন্য।'

অতঃপর, 'একটা অদ্ভুত শব্দ। নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।'

সারাটা রাত হিংস্র বাঘের গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে গেল লাল মৃত্যুর গহ্বরে, সভ্য শিকারির বন্দুকের গুলিতে। শিকার একটা আনন্দ। ওয়েল ডান, ওয়েল ডান। কী তোমার এম মিস্টার দত্ত। ম্যাকিন্টশ পার্কার কোম্পানির ডিরেক্টার। বন্ধু বান্ধবী নিয়ে জঙ্গলে এসেছেন—ফরেস্ট ইজ মাই ফার্স্ট লাভ। না, গাছ-পালা দেখেন না, চেনেন না। সে বাসনাও নেই। ভ্যানগগের মতো ভাই থিয়োকে কোনো দিন লিখবেন না, 'I got up very early this morning because as you can imagine. I am very curious to see it all.' খুব ভোরে উঠেছি কারণ আমি সব দেখতে চাই। কোন আলোয় পৃথিবীটা কেমন! শুধু প্রকৃতি নয় মানুষের জীবন লীলাও দেখতে চাই। কাঁদতে চাই। গ্রামের পথে দরিদ্র মাতা বুকের কাছে শীর্ণ শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে দুর্বল চলনে হেঁটে যাচ্ছে, আশাহীন দুটি চোখ। শিল্পী ভ্যানগগ অশ্রু বিসর্জন করেন। পবিত্র চোখের জল। I will see it all. কোন্ পৃথিবীতে কাদের কাছে আছি। হঠাৎ খুঁজে পেলাম ঊষর প্রান্তরে অদ্ভুত সেই কবরখানা। চারপাশে নিবিড় পাইনের ঝোপ। ছোট ছোট গাছ। বড় হওয়ার আগেই মাটির দোষে বুড়িয়ে গেছে। ঢোকার একটা গেট আছে। ভেতরে বেশ কয়েকটি কবর। ঘাস আর আগাছায়

আচ্ছাদিত। প্রতিটি সমাধির ওপর একটি করে সাদা স্তম্ভ। মৃতের নাম লেখা। মাথার ওপর ঝকঝকে আকাশ এই পাইনের ঝোপে গুল্মাচ্ছাদিত কবরখানায় আলো পাঠাতে পারেনি। রহস্যময় আধো অন্ধকার। টারপেন্টাইনের উগ্রগন্ধ। সব মিলিয়ে অদ্ভুত অপ্রাকৃত পরিবেশ।

আমাদের কবি! বলুন তারপর, সেই না-ভোগী, না-যোগী, সুসভ্য অসভ্যদের বাদামি হরিণ শিকারের কাহিনী!

তারপর? 'আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো! নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প। সিগারেটের ধোঁয়া। টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা। এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম-নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।'

কবি জানালেন, তবু এই মায়াবী পৃথিবীতে, চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসের বাতাসে, মৃত্যুর ঘনকালো কালী-ছায়ায় জীবনের আবেগে,

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে-
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

প্রেম হয়েছিল সোনালির সঙ্গে। বিশু গান গায় রাজনীতির দলে। বিয়ে হল ফাল্গুনে। অভয়ের ইচ্ছে ছিল সোনালিকে বিয়ে করে। শেষ ফাল্গুনের অল্প শীতে বিশু বউয়ের বুকে মুখ গুঁজে, পা দুটোকে ভাঁজ করে স্বপ্ন দেখছিল—যদি রোজগার বাড়ে, যদি বেশ ধনী হতে পারে কোনোদিন, তাহলে অদ্ভুত কোনো এক নদীর ধারে একটা মঞ্জিল বানাবে, সবুজ ঘাসে ঢাকা একখণ্ড জমি ঢলে তাকবে নদীর জলের দিকে। রাতের নীল কালো মায়ার রহস্যে, রাতফোটা ফুলের সুবাসে, জলের অস্পষ্ট সংগীতে কোথাও এক কুঞ্জে বসে থাকবে দুজনে। বহু দূরে চাঁদের পড়ন্ত আলোয় প্রায় ওপারের কাছ দিয়ে সাদা পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের ফেনার মতো সাদা, বিলাসী এক ময়ূরপঙ্খী। অপ্সরাদের কণ্ঠে কেউ গান গাইছে— জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।

এমন সময় পুরোনো কালের পলকা দরজা ভেঙে ঘনকালো কিছু ছায়ামূর্তি ঢুকলো ঘরে। ঘরে ছড়িয়ে গেল মদ আর প্রতিহিংসার গন্ধ। ঠোঁট ফাঁক না করে কেউ একজন বললে —এই যে শালা! তারপর, সভ্য দুনিয়ার সেই গল্প ধারাবাহিক, ধর্ষণ, খুন, প্রতিহিংসা, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা, ব্যভিচার, যৌনতা।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে, বাজল কটা?

কাল উত্তর দিলে, ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড আমার ঘড়িতে নেই। দিন নেই, বছর নেই। শতবর্ষের হিসেবে বলতে পারি, শতাব্দী প্রায় শেষ হল। অনেক হাততালির শব্দ। কালের রঙ্গশালা প্রায় ফেটে পড়ে। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কে একজন বললেন, 'আমি হিউমারিস্ট। বিউটি, বিউটি। It is better to have as horrible ending than to have horrors without end

সুখী গৃহকোণ

অতীতে একটি বিজ্ঞাপনের একটি লাইন মানুষের মুখে মুখে ফিরত 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন।' গ্রামোফোন কেউ বলতেন না, বলতেন গ্রামাফোন। সেই স্লোগানটি আজও অনেকে স্মরণ করেন, যাঁরা প্রাচীন। অবশ্যই ব্যঙ্গার্থে। কোথায় সুখ, কোথায় গৃহকোণ, কোথায় গ্রামোফোন! এখন স্বার্থের নাম হয়েছে সুখ, সেখানে ত্যাগের নাম ছিল সুখ। ত্যাগের মোড়কে সুখ থাকে। আর সুখের মোড়কে থাকে স্বার্থপরতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা। সেকালে মানুষ নদীতে, দীঘিতে সাঁতার কাটত। একালের নব প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী, ব্যবসাজীবী, রাজনীতির কাঠঠোকরার জাঙ্গিয়া পরে ক্লোরিন দেয়া বাসি জলের ডোবায় হাপুর হুপুর করে। এরই নাম সুইমিংপুল। কেউ বলছে, 'হাই', কেউ বলছে, 'ইয়ার'। প্যাকেট ছিঁড়ে পানমশালা। এটি কলির লেটেস্ট। অধিক ব্যবহারে ঠোঁটের 'এনভেলাপ' সেঁটে যাচ্ছে। 'ইয়ার' অথবা 'জানোয়ার' কোনো শব্দই অপ্রকাশ। ডাক্তারি ছুরিতে সেই সাঁটাই খুললে ভালই, না হলে 'ডেফ অ্যান্ড ডাম্বের' 'কোড ল্যাঙ্গোয়েজ'। এরই নাম সুখ। কালা আর বোবা। অন্যের প্রার্থনা, আবেদন, আর্জি শুনতে পাইনা। অন্যের ব্যথা, বেদনা, নিগ্রহ, যন্ত্রণা দেখতে পাই না, তখন অবশ্যই বোবা। এই উদ্ধৃতিটি ভারি কালজয়ী।

> Men are the only animals that devote themselves,
> day in day out, to making one another unhappy.

মানুষ নামক জন্তুর দিবারাত্র একটাই কাজ, পরস্পর পরস্পরকে অসুখী করা। কি সংসারে, কি পথে, কি যানবাহনে, কি কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র এক স্লোগান, আয় ভাই চুলোচুলি করে প্রমাণ করি, আমরা জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ। বেদ-বেদান্ত, গীতা, বাইবেল এসব না কি আমাদের উত্তরাধিকার! কেয়া বাত! কঠোপনিষৎ-এর ঋষি শান্তিপাঠ করছেন,

> ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
> তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
> ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ঋষির প্রার্থনা ঃ পরমাত্মা আমাদের উভয়কে (গুরু ও শিষ্য) সমভাবে রক্ষা করুন ও উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন; আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি; আমাদের উভয়েরই লব্ধ বিদ্যা সফল হউক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

জীবনের শান্তি এখন শ্রাদ্ধের প্রার্থনা। মরে তুমি শান্তি পাও। হে আমার প্রিয় পরলোকগত। ওখানেও তো বাঙালির আত্মা কিলবিল করছে। ওখানে আর দয়া করে ফ্যাঁসফোঁস করো না।

এক সময় কিন্তু সুখী গৃহকোণ ছিল। যৌথ পরিবার, চকমেলান বাড়ি। পাঁচখান ভাই। পাঁচজন বউ। রাশভারি গৃহকর্তা। নম্র কিন্তু রাশ ধরে থাকার মতো গৃহকর্ত্রী যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। শিশুদের কলরবে মুখর একটি বাড়ি। আত্মীয়-স্বজন, অতিথি অভ্যাগতে সদা ভরপুর। কারও ভুরু কুঁচকে নেই। কারও মুখে বিরক্তি নেই। বিশাল একটি পরিবারের শরিক তারা। সকালে জেগে উঠে রাতে ঘুমিয়ে পড়া। শয্যার একান্ত নিভৃতিতে কোনো স্ত্রী তাঁর স্বামীর কর্ণ দূষণ ঘটাতেন না। বড়র পাতে বড় মাছের টুকরো, ছোটর বাটি থেকে ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে আছে রুইয়ের মাথা, তোমার পাতে ন্যাজা কেন? এইসব ছোট ছোট নীচতা স্থান পেত না। সে-সব ছিল বড় মাপের বাঁচা। উদার প্রান্তরে বড়, ছোট বিভিন্ন আকারের গাছের একই ভূমি থেকে প্রাণ-রস শুষে নেওয়া, একই বাতাসে আন্দোলিত হওয়া, একই বৃষ্টিতে ভেজা।

বাবা সব জানেন, মা সব সমস্যার সমাধান করেন। পাঁচ বউয়ের যা হয় সব একসঙ্গে হয়। গাঁট আসে শাড়ির। স্যাকরা এসে মাপ নিয়ে যায় গয়নার। পাঁচ পরিবার থেকে আসা পাঁচটা মেয়ে যেন সহোদরা। সকলেই সকলের স্বভাব জানে। বড়র ঝাঁজ একটু বেশি। মেজ একটু কবি কবি। সেজটা আউপাতালে মা দুর্গা। নটা ডাকাবুকো! ছোটটার ভূতের ভয়। যেন একই ঝুড়িতে লঙ্কা, বেগুন, টোম্যাটো, সজনে ডাঁটা, ডুমুর। মিলেমিশে সুস্বাদু সব তরকারি। ভালবাসায় তরিবাদি।

ভায়েদের মধ্যে বড়দা 'হেড'। পিতার পরেই। ব্যায়াম আর ব্যবসা এই তাঁর নেশা। সব মানুষের খবর রাখেন। দুঃখ-সুখে সকলের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সকলের সব সমস্যার একটি মাত্র সমাধান বড়দা। মদনবাবুর ছোটমেয়ে দুপুরবেলা দোতলার বারান্দা ভেঙে রাস্তায় পড়ে গেল। বড়দা তাকে পাঁজাকোলা করে হাসপাতালে ছুটলেন। মেয়ে বেঁচে গেল। তারপর বড়দা একদিন মেয়ের মাকে আচ্ছাসে বকলেন, 'আমার মায়ের একটা নয়, দুটো নয়, সাত সাতটা ছেলে মেয়ে। আমরা সব কটা বেঁচে আছি বহাল তবিয়তে, আর তোমার দুটো! দুটোতেই হারাধনের দশটি ছেলের অবস্থা!' লাজুক মা-টি বড়দাকে প্রণাম করে বলছে, 'আপনি দেবতা! মেয়েটা আপনার জন্যেই প্রাণ ফিরে পেল বড়দা।' মদন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লেন।

এই বড়দার অনেক রূপ। কখনও ধোপদুরস্ত কেতাদার বাবু। কখনও মজুর। মাটি কোপাচ্ছেন, খড় কাটছেন, গরুর খাবার। কখনও ভাইপোদের কোনো একটাকে কাঁধে চাপিয়ে দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে হাঁসের খেলা দেখছেন। সব সময় মুখে একটা প্রসন্ন হাসি। যে সকলের, যার সকলে, তার জীবনটা তো সঙ্গীতের মতো। রাত্তির -বেলা বড়দা যখন মেঝেতে আরাম করে বসেন, তখন সকলে ঘিরে আসে। একপাশে বৃদ্ধা মা। পাকা পেয়ারার মতো টুসটুসে। সন্ধেবেলা ঠাকুরঘরে অনেকক্ষণ ছিলেন কপালে চন্দনের টিপ। শরীরে বেলফুলের সুগন্ধ। কোলে মাথা রেখে রেখে শুয়ে আছে মেজর স্কুলে পড়া মেয়েটা। ঠাকুমার নেওটা। বিকেলে চুলে তেল দিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছেন টানটান করে নিজে হাতে। জোড়া বিনুনি। কপালে টিপ পরিয়েছেন সপ্তাহে দুদিন ঝামা দিয়ে গোড়ালি ঘষে দেন, যতক্ষণ না গোলাপি রঙের আভা ফুটছে

রাতে তাঁর কাছেই শোয়। মহাভারতের গল্প শুনতে, শুনতে ঘুম। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনের রথ ছুটছে। অভিমন্যু যেন তার ভাই। স্বপ্নে বিড়বিড় করে, মেরো না, তোমরা মেরো না। বৃদ্ধা বুঝতে পারেন, টুসি স্বপ্ন দেখছে। নিজের নরম শরীরে জড়িয়ে ধরেন। হাতের বালা, শাঁখা রাতের অন্ধকারে কথা বলে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়,

এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্যগানে
আমার শিশুর মুখে কলকোলাহলে
সে-যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে।

ছোট বউ বড়দার এলোমেলো চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। মেজ বউ বায়না ধরেছে 'মুসুরি'-তে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। মেজ ভাই অধ্যাপক। সে একপাশে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। বললে, 'জায়গাটা খুব ভাল, লান্ডুর, লালটিব্বা, গান হিল, লাইব্রেরি রোড। মায়ের কেবল কাশী, পৈরাগ। একবার চলো, গাউন পরে গানহিলে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমরা দাবি তুলব।'

বৃদ্ধাও কম জানে না। বললেন, 'একটা করে কোট কিনে দে। পাশে থাকবে তোদের বাপ, ব্রাউন সায়েব। সাদা কোটের কলারের ফুটোয় লাল একটা মাছি গোলাপ।'

সবাই উল্লাসে চিৎকার ছাড়ল, 'এনকোর, এনকোর।'

বৃদ্ধকর্তা বিলিতি হোটেলে ম্যানেজার ছিলেন। সায়েবি কেতা। লাট সায়েবের বউকে বেনারসী মিঠা পান খাইয়ে সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। বাইরে সায়েব, বাড়িতে পুরদস্তুর বাঙালি। সন্ধ্যা-পূজা করেন। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজা হয়। সেই সময় বাড়িতে বহু মানুষের আগমন। সেজ ছেলে ডাক্তার। ধীরে ধীরে সুনাম আর পসার বাড়ছে। সবাই বলে, আগে প্রতাপ ডাক্তার দেখুক। না হলে, তখন অন্য ডাক্তার ভাবা যাবে।

সুখের উৎস, অর্থ, বিত্ত, সামর্থ্য নয় কিন্তু। উৎস হল, মানুষ। গেটের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয়— He is the happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home. রাজা অথবা চাষা একমাত্র তখনই সুখী যখন সে একটি শান্তির সংসার রচনা করতে পারে। গোয়ালে আগুন লাগলে সব গরুরই ল্যাজ খাড়া।

রবীন্দ্রনাথের সেই অচলাবুড়ির মধুর চিত্রটি স্মরণে আসছে,

অচলাবুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ক অতিমধুর জরা।
ফুলোফুলো দুই চোখে তার, দুই গালে আর ঠোঁটে
উছলে-পড়া হৃদয় যেন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে।

একালের একজন অতি আধুনিক যুবক আধুনিকতার পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে আসার পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে হলেও সত্যটি উপলব্ধি করেছে, যে-বাড়িতে ঠাকুমা,

ঠাকুরদা নেই, দিদিমা, দাদু নেই সে-বাড়ি সরাইখানার মতো। থাকাটাই আছে, থাকার আনন্দটা নেই। ভোগের উপকরণ অনেক থাকতে পারে, সবই ভোগান্তির মতো। সুখ এমন এক যাদুদণ্ড, যা অভাবেও ঐশ্বর্য আনে। দুটি চৈনিক প্রবাদ এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসছে ঃ Peace in a thatched hut that is happiness. পর্ণকুটীরের শান্তির নাম সুখ। ইমারতাদি হল সুখ-শান্তির কবরখানা। ইটে ইটে সঙ্ঘর্ষ, মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকির কাংসবাদ্য। আর একটি প্রবাদের চৈনিক দর্শন, He who leaves his house in search of happiness pursues a shadow 'কোথায় তারে বেড়াস খুঁজে।' সে যে নিজের প্রিয় পরিজনের মধ্যেই আছে। বাইরে নেই। কে বলেছিলেন জানা নেই, East or West. home is best.

সেকালের কথা। পুকুর পাড়ে মাস্টার মশাইয়ের ছোট্ট কুটীর। নিকনো দাওয়া। মাদুর পাতা। ছোট্ট একটি কাঠের ডেস্ক। দাওয়ার উত্তরপাশে মাঝারি মাপের একটি বালতিতে এক বালতি জল। ঝকঝকে একটি কাঁসার ঘটি। তারে ভাঁজ করা পরিষ্কার একটি গামছা। অদূরে সাদা ফুলে ভরা একটি টগর গাছ। নয়নতারা আর কৃষ্ণকলির ঝোপ। ডাঁটা ঝোলা, সিরসিরে পাতা সজনে গাছ। একটি পেয়ারা গাছ। ন্যাজ ঝোলা এক জোড়া টিয়া পেয়ারা পছন্দে সরব।

সামান্য রোজগার। সেকালের শিক্ষক। সরস্বতী আর লক্ষ্মীকে এক সঙ্গে করার কৌশল জানতেন না। মোটা লংক্লথের পাঞ্জাবি, মোটা ধুতি, পায়ে একজোড়া বহুচলায় বিধ্বস্ত চটি। চোখে পুরু কাঁচের চশমা!

দুপাশে তাল, খেজুরের সারি। সরুপথ। একটু একটু ঘাস। সেই পথের শেষে মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি। মাঝারি মাপের উঠান, বেড়া দিয়ে ঘেড়া, রাংচিতা,

গাবভেরেণ্ডা। সেই উঠানে আমরা দাঁড়িয়েছি। মাস্টার মশাই ডাকছেন, 'ও গো, দেখ গো, আমার ছেলেরা এসেছে।'

'আমার ছেলেরা এসেছে'— আজও কানে বাজে। এই বৈশ্যদের প্রেমহীন খরার যুগে এমন সম্বোধন বিরল। একালে বাবারা সব লোপাট। সবাই পেন্টুলপরা ড্যাডি। মায়েরা সব মামি। মামার বউকে কি বলে ডাকবে কে জানে! আংকলের ঠেলায় অস্থির। দাদা, কাকাদের যুগ শেষ।

যে-প্রসঙ্গ হচ্ছিল, মাস্টার মশাইয়ের ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গুরুপত্নী। সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। লালপাড় সাদা শাড়ি। সংসার সাধনার পবিত্র স্পর্শ মুখে। অমলিন হাসি। ঝকঝকে

কাঁসার বাটিতে সরষের তেল মাখা ফুলোফুলো মুড়ি। নারকোল। কাঁচালঙ্কা। একটি করে তিলের নাড়ু। একদিকে খাওয়া, অন্যদিকে মাস্টার মশাইয়ের পরম উদ্বেগ, ফাইনাল এসে গেল, তোরা ঠিক মতো পড়ছিস তো! ব্রজেন! তোর অঙ্কের কি খবর? সাধন! ইংরিজিটার দিকে বেশ করে নজর দে।

যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে মাস্টার মশাইয়ের পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর দেখতে পাচ্ছি। গোবর নিকনো উনুনে কয়লার আঁচ। কড়ায় ডাল ফুটছে। গুরুপত্নী পুঁইশাক কাটছেন, পাশে একফালি কুমড়ো। শিল-নোড়ায় বাটনা বাটার আয়োজন। পুঁইশাক ছাড়া আর একটি পদ হবে, আলুপটলের তরকারি। জামবাটির জলে পটল ভাসছে। সেকালের পটল একালের পটলের মতো সবুজ রঙ ছাড়ত না। রান্নাঘরের গরমে দৃঢ়, দৃপ্ত, সুন্দর মুখের সুন্দর কপালে ঘামের বিন্দু। ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরের টিপ। আলনার বদলে, দুপাশে দড়ির বাঁধনে ঝুলছে তেলা একটি বাঁশের খণ্ড। সেই বাঁশে ঝুলছে নিখুঁত পাট করা কয়েকটি ধুতি, শাড়ি। অধিক কিছুই নেই অথচ কি পূর্ণতা! নির্লোভ, কপটতা শূন্য এক দম্পতির শান্তির সংসার। উঠনে এক জোড়া রং-বাহার প্রজাপতির ওড়াউড়ি। যেন অদৃশ্য কোনো আনন্দের সন্ধান পেয়েছে।

প্রাচুর্য এক অভিশাপ। মানুষ আর মানুষ থাকে না, দানব হয়ে যায়। অহংকারের টঙ্কার। অবিরাম রামায়ণ। রাম-রাবণের যুদ্ধ। হামভি মেলেটারি, তোমভি মেলেটারি। সম্পর্কের বোঝাপড়াতেই শান্তি। সবচেয়ে মারাত্মক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর। নারী শক্তির অংশ। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। সম্পর্ক জমে গেলে ফুল ফুটবে, নয়ত দাবানল। 'জোহার' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ হচ্ছেঃ

God creates new worlds constantly. In what way?

By causing marriages to take place.

ঈশ্বর অনবরত নতুন জগৎ সৃষ্টি করে চলেছেন। কী ভাবে? বিবাহ্। আমাদের অতীত ঋষি চিন্তায় কী অদ্ভুত মিল! আমরা মানি, না মানি, পেছন ফিরে থাকি, কিচ্ছু যায় আসে না, আমাদের, শুধু ভারতীয়ের নয়, সারা বিশ্বের মানুষের সংস্কারে এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন। সাগরপারের মানুষ বলবেন, গড। আমরা বলব ভগবান। একালের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্‌গণ বলবেন, এ গ্রেট পাওয়ার। শক্তি। সৃজন, পালন, নিধনকারী শক্তি। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সৃজনীশক্তির নাম ব্রহ্মা।

এইবার 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে চলে যাই। সৃষ্টির শুরুটা দেখা যাক। প্রথমে এক। একটা কিছু তো ছিলই। অবিভাজিত, অবিকৃত একটা শক্তি। তন্ময় শক্তি। সেইটাই উপনিষদে আত্মা। সেই এক বহু হবেন। 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ'। সংস্কৃতের কচকচিতে না যাওয়াই ভাল। হচ্ছে সুখের কথা। সুখের সন্ধান নেই। দুঃখের ওপর দুঃখ সংস্কৃতজড়িত ধর্ম! না, ধর্ম নয় বিস্ময়। রূপকে জড়িয়ে ঋষিরা কি বিজ্ঞান রেখে গেছেন! জড়বিজ্ঞানীরা যাকে অতিক্রম করে যেতে পারলেন না। সেই এক এবং অদ্বিতীয় এক পুরুষ। পজেটিভ। তখনও সৃষ্টির কাজ—বিভাজন শুরু হয়নি। যাক, বিজ্ঞান আমাদের প্রসঙ্গ নয়, আমাদের প্রসঙ্গ, মানুষ, মানুষের সংসার।

সেই এক, সেই আত্মা সচেতন হয়ে জানতে পারলেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। অসীম, অনন্তের আমি একা অধীশ্বর। তাঁর মনে ভয় এল। সঙ্গে সঙ্গে বিচার এল, দ্বিতীয় যখন কেউ নেই, তখন কিসের ভয়! কাকে ভয়। একাকীত্বের অস্বস্তি। আনন্দের অংশীদার তো একজন চাই। তখন, স দ্বিতীয়ম ঐচ্ছৎ। নিজের দিকে তাকালেন। নিজের আত্মার দিকে। দেখলেন, আত্মার দুটি সত্তা। পুরুষ আর প্রকৃতি। পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ। সে কেমন অবস্থা! যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শনে, অর্ধবৃগলমিব। ভিজে একটি ছোলা বা মটরকে ছাড়ালে দেখা যাবে, সমান দুটি ভাগ। যেন বন্ধ দুটি কপাট। দুটি অর্ধবৃত্ত পরস্পর সংলগ্ন। এক একটি অংশের নাম বৃগল বা বিদল। তিনি নিজেকে তৎক্ষণাৎ দুভাগ করে ফেললেন। দুটি সত্তা হল, পুরুষ আর স্ত্রী, পতি এবং পত্নী। স্ত্রী সেই কারণেই অর্ধাঙ্গিণী। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের একটি সংস্কার সেই কারণে বিবাহ। বিবাহ হল শুদ্ধিকরণ। অপূর্ণের পূর্ণ হওয়া। দুটি বিদলের বহির্মিলন। সেই মিলনের চরম অনুভূতি—আত্মার মিলন—ব্রহ্মানুভূতি। তখন, শিব শক্তির রমণ। তখন তন্ত্র। শিব আর শক্তি কিন্তু অভেদ! শিবেরই শক্তি, শক্তিরই শিব। শক্তিকে ধারণ করে শক্তিমান যিনি তিনিই শিব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শক্তি হারা শিব শব হয়ে পড়ে আছেন শক্তিরূপিনী মা কালীর পদতলে। তন্ত্র অতিবাস্তব দেহকে অস্বীকার করে না। দেহ ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক। সেই দেহেই আছে পরমশক্তি। তিলে যেমন তেল, সেইরকম পরিব্যাপ্ত শক্তিতে বিশ্ব ভরে আছে। তন্ত্র আর বেদান্ত সেই 'এক'-এ গিয়ে মিলেছে। তন্ত্র এগোচ্ছে দেহ ধরে, বেদান্ত এগোচ্ছে মন ধরে।

আমরা এগোচ্ছি দ্বন্দ্ব ধরে। এইটিই হল আধুনিক জড়বাদী, ভোগবাদী সভ্যতার দান। আমাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সংসার শেখাবেন বলে বিবাহ করেছিলেন। সংসারই তো সব। যত দিন সৃষ্টি আছে, মানুষ আছে, জীবজগৎ আছে, ততদিন একটি নারী, একটি পুরুষ, গৃহ একটি, সন্তান সন্ততি। এর বাইরে যা, তা স্বাভাবিকের এলাকার বাইর। সংসারী যদি সমঝে না চলে মরবে। সেই সমঝে চলাটা কেমন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'শিবের সংসার'। শান্তির সংসার। ভোগ-দুর্ভোগের সংসার নয়, প্রেম আর পবিত্রতার সংসার। সাত্ত্বিকের সংসার। সাধারণ মানুষের পাশে বসে বন্ধুর মতো পথ চলার নির্দেশ। আমি গুরু নই, আমি অবতার নই, ঢিপঢাপ প্রণামেরও দরকার নেই। শুধু শুনে নাও, আমি তোমাদের এক সহমর্মী, সহধর্মী। আমি তোমাদের মন বুঝি, প্রবণতা বুঝি, সংস্কার বুঝি। অন্ধকারে পোকার মতো কি কিলবিল করছিস! 'স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতই স্ত্রীলোকে ভালবাসে—তাই দুজনেই শিগগির পড়ে যায়; কিন্তু সংসারে তেমনি খুব সুবিধা। বিশেষ দরকার হলে হল স্বদারা সহবাস।'

সংসারী হতে হবে, কারণ কামনা, বাসনা। মানুষের প্রবল দুটি প্রবণতা—কাম আর কাঞ্চনে আসক্তি। বিখ্যাত আমেরিকান কবি Robert Frost -এর একটি উক্তি স্মরণে আসছে— 'It's a funny thing that when a man has not anything on earth to worry about, he goes off and gets married.' কিছুই করার নেই তো একটা বিয়ে করে ফেলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে একটি গল্প বলছেন, "বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাড়ী- এ গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এরা সিদ্ধ হল, লোককে যা বলবে তাই ফলবে যেদিক দিয়ে যাবে সেই দিকেই ভয়; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।' এই ভেবে বীরভদ্র তাদের বললেন, তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে এসো। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান করতে করতে সমাধি হল। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুঁশ নাই! আবার ভাঁটা পড়ছে তবু ধ্যান ভাঙে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল—বীরভদ্র কী বলবেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, তাই তারা সরে পড়ল, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা করলে না। বাকী বারশো দেখা করলে। বীরভদ্র বললেন, 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা করবে। তোমরা এদের বিয়ে করো।' ওরা বললে, 'যে আজ্ঞা, কিন্তু আমাদের মধ্যে একশোজন কোথায় চলে গেছে।' ওই বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাকতে লাগল। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না; কেননা, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কাহিনী থেকে জীবনে ফিরে এলেন। বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন, " তোমরা নিজে নিজে তো দেখছ, পরের কর্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছ। আর দেখ অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল 'কামিনী'। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার জো নাই। তাই এত অপমানবোধ, এত দাসত্বের যন্ত্রণা।"

আমাদের জীবনের অতিবাস্তব চিত্র। বিলকুল মানুষ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবে এ তো ভাবা যায় না। অভিপ্রেতও নয়। বৈরাগ্যে ব্যক্তিজীবনে শান্তি আসতে পারে, দেশের কি হবে। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ— (জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য) দেশজুড়ে অলস সন্ন্যাসীর এতটাই সংখ্যা বাড়িয়েছিল, যে দেশও যায়, সন্ন্যাসধর্মও যায়। তখন রামানুজ এসে প্রতিষ্ঠা করলেন এই মত। ব্রহ্মও সত্য, জগতও সত্য। সন্ন্যাসী নয়, সদাচারী গৃহী হও। উপনিষদকে নিয়ে এসো জীবনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই আধুনিক যুগের চূড়ান্ত উপদেষ্টা। পথপ্রদর্শক। বাতিঘর। বলছেন, 'পলায়ন নয় প্রবেশ। মায়ার জগতে প্রবেশ করো। প্রবেশ করো পৃথিবীর ভেলকিতে। তবে অন্ধের মতো নয়। জেনে শুনে প্রবেশ। দুঃখ আর অশান্তিই বেশি। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সেঁকুলে কাঁটার মতো এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়।'

তা হলে উপায়! সব ত্যাগ করে, দোকানপাট বন্ধ করে বেরিয়ে পড়া। অতই সহজ! কমলি নেহি ছোড়তা। প্রত্যেকেরই শেকড়-বাকড় জমিতে নেমে গেছে। টেনে তুলতে গেলেই ঝুলঝুলি সব উঠে আসবে। ঠাকুর বলছেন, নদের হাট বসিয়ে পালাবে

কোথায়! কে খাওয়াবে তোমার পরিবার পরিজনকে! ও পাড়ার মামা! কর্তব্য একটা মস্ত বড় জিনিস। কর্তব্য পালন না করাটা মহাপাপ। প্রত্যেক মানুষই ঋণী। পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ, পরিশেষে স্ত্রীর ঋণ। একটি মেয়েকে তার পরিবেশ থেকে সমূলে উৎখাত করে নিয়ে এলে। বললে, তুমি আমার ধরমপত্নী। জনম, জনম কা বন্ধন! তারপর সব ভুলে মেরে দিলে। ইয়ারকি! মানুষের জীবনে স্ত্রী কি কম জিনিস! কত বড় শক্তি, কত বড় আশ্রয়! ঠাকুর দৃঢ়স্বরে বলছেন, 'মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে জাঁতি থাকে—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বড় মায়াপাশ ছেদন করবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'শক্তিই জগতের মূলাধার।' বলেই, শক্তির বিভাজন করছেন, 'সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই আছে।' স্ত্রী যদি অবিদ্যারূপিনী হন, তাহলেই ঘোর অশান্তি। সংসার-পাঁকে ভড়ভড় করে ডুবিয়ে দেবেন। পৃথক হও ভিন্ন হও। আমার দাসত্ব করো। আমার খিদমত খাটো। মুখরা, কলহপ্রবণা। আগুন জ্বাল, আগুন আগুন জ্বাল। তখন সেই তুলসীদাসজীর দোঁহা, 'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক্ পলক্ লহ চোষে।' তখন সোক্রাতেসের সেই উক্তি, By all means marry. If you get a good wife you will become happy-and if you get a bad one you will become a philosoher. বউ ভাল হলে সুখী, খারাপ হলে দার্শনিক হবে তুমি। আজকাল কেউ দার্শনিক হয় না। হয় ছাড়াছাড়ি, না হয় 'টেনসানে, টেনসানে' হাইপার অ্যাসিডিটি, আলসার, ক্যানসার। দু-ছত্র কবিতাও লেখা যেতে পারে- 'সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত। কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত।' সংসারে পুরুষের দায়িত্ব অনেক। প্রবৃত্তিমার্গে খলবল করে খেলে বেড়ালে সংসার দাসখত লিখিয়ে নেবে। 'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়। আমার খেটে খেটে খেটে জনম গেল কেটে, তবু তো খাটা না ফুরায়। আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই, কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই। চোখে জল ঝরে, মুছি এক করে, অন্য করে বোঝা তুলি মাথায়।' সংসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, মধুর শাসনে ধরে রাখা একটা মস্ত বড় আর্ট। রাজ্যশাসনের মতোই। ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকালেই 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি।' সংসারে একজন পি. এম থাকবে। বাবা অথবা মা। বাবা হলেই ভাল হয়। মা হবে হোম মিনিষ্টার। পিতা আদর্শবান না হলে ছেলে, মেয়ে এমন কী বউও সুযোগ নেবে। তখন ঘুষ দিয়ে গদি বাঁচাতে হবে। এখন সেই অবস্থা, সব সংসারই ঘুষোঘুষির সংসার। তালি মেরে বাঁচা। তালি মারতে মারতে আসলটাই অদৃশ্য। অথচ জ্ঞান বলছেন, There are three partners in man: God, his father and his mother, ঈশ্বর, পিতা এবং মাতা। মাতা আসছেন কোথা থেকে? আকাশ থেকে? না, স্ত্রীই ক্রমে মাতা হচ্ছেন। আবার এও বলা হচ্ছে, জন্ম দিলেই মা হয় না। অনেক দায়িত্ব তাঁর।

এক রাজা তাঁর ধর্মযাজককে বলছেন, 'আপনার ভগবান চোর!'

'কেন চোর!'

'আদমকে ঘুম পাড়িয়ে আপনার ভগবান তার একটি পাঁজর চুরি করেছিলেন।'

ধর্মযাজকের বুদ্ধিমতী কন্যাটি সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'পুলিস, পুলিস! মহারাজ পুলিস ডাকুন।'

মহারাজ প্রশ্ন করলেন, 'পুলিস কেন?'

মেয়েটি বললে, 'কাল রাতে চোর এসেছিল আমাদের বাড়িতে। একটা রুপোর ঘড়া চুরি করে নিয়ে গেছে, তবে তার জায়গায় একটা সোনার ঘড়া রেখে গেছে।'

মহারাজ বললেন, 'আহা এমন চোর যদি রোজ আসত আমার প্রাসাদে।'

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললে, 'মহারাজ! তাহলে ভগবানের অপবাদ দিচ্ছেন কেন? আদমের একটা পাঁজর তিনি চুরি করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু মহারাজ! তার বদলে ভগবান যে তাকে একটি মহামূল্য জিনিস দিয়েছিলেন!'

'কী এমন জিনিস!'

'কেন মহারাজ, স্ত্রী। অর্ধাঙ্গিনী। মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। পরিচালিকা শক্তি।'

মেয়েটির রবীন্দ্রনাথ জানা থাকলে বলতে পারত সেই অমোঘ জীবন দর্শন,

> ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
> কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি ।
>
> পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
> মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি।
>
> ....
>
> দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে-
> মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।

সুখ আছে সম্পর্কে, সুখ আছে সহ্যে, সুখ আছে মনে। তার প্রকাশ, এক সাধনা

উঃ, কী গরম পড়েছে দাদা

যাক দুটি ইস্যু পাওয়া গেছে। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, বিয়ে বাড়িতে এমন কি শ্মশানেও আলোচনার বিষয়। এক নম্বর, গরম। গরমখানা একবার দেখেছেন মশাই! বইয়ের মলাট চোখে সামনে দেখতে দেখতে বেঁকে ডোঙা মেরে গেল। গাছের ডালে বেল জ্বলছে, চিড় ধরে গেল। বালির শয্যায় ফুটি-ফেটে চৌচির। চিল বেলা বারোটার সময় এক চক্কর মারার জন্যে আকাশে উঠেছিল। যখন নেমে এল গাছের ডালে, শুকিয়ে হাফসাইজ, যেন কাক। রুটি টোস্টারে দিতে হচ্ছে না, জানলার ধারে রাখলেই হল। খড়খড়ে টোস্ট। মাথার তালু সদাসর্বদাই গরম। নারীজাতি স্বাভাবিক ভাবেই উগ্র। এখন যা অবস্থা, স্ত্রীকে ডাকলেই হাবিলদারের মতো গলায় উত্তর দিচ্ছে। রান্নাঘর থেকে যখন তেড়ে আসছে তখন মনে হচ্ছে, চলমান মাছের ঝোল। সর্বাঙ্গ দিয়ে টস টস করে ঘাম ঝরছে। নামকরা ময়রার দোকান, এতটাই হাইজিনিক, হালুইকরকে ব্লটিং পেপারের ফতুয়া পরিয়েছে। এখন হাড্ডাহাড্ডি কমপিটিশনের যুগ। একজোড়া মোজা কিনলে একজোড়া জুতো ফ্রি। একজোড়া জুতো কিনলে একজোড়া চটি ফ্রি। আইসক্রিম কম্পানি ডিপফ্রিজে বসিয়ে আইসক্রিম খাওয়াচ্ছে। বিজ্ঞাপনে লিখছে, শেষপর্যন্ত আইসক্রিম আইসক্রিমই থাকবে। লোশান হয়ে যাবে না।

দ্বিতীয় ইস্যু, কেন্দ্র। কে বসছে পরবর্তী ডিগবাজির জন্যে! ইতালি না ইন্ডিয়া! আর একটা ছোট্ট সাইড ইস্যু—ক্রিকেট। আমাদের আদরের আজ্জু, কলকাতার প্রিন্স, বিশ্ব শচীন. তিন শূন্য না আগে একটা এক থাকবে!

তবে কোনো ব্যাপারই বেশিক্ষণ মাথায় রাখা যাচ্ছে না। গরমে হয় উবে যাচ্ছে, না হয় নেতিয়ে পড়ছে। একটা ব্যাপারই থাকছে, সেটা দুঃসহ গরম। গরমের কোনো শোভা নেস, আকর্ষণ নেই, এমন কথা বলি কি করে! এমন উত্তপ্ত, উজ্জ্বল দিন, এমন নীলকান্ত, ফুরফুরে বাতাসে ভরা সন্ধ্যা কোন ঋতু উপহার দিতে পারে! এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তেজস্বী একটি ঋতু। যেন উপনিষদের ঋষি হোমানল জ্বেলে ধ্যানে বসেছেন! বাতাস কাঁপছে ঝিঁঝির পাখার মতো।

যাঁরা বাতাস বলতে ঘূর্ণায়মান পাখার বাতাসই বোঝেন, জীবন বলতে বোঝেন ইটের কংক্রিটের কফিন গ্রীষ্ম, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন মৌনী তাপস, সেই গ্রীষ্মের ভয়ংকর আকর্ষণটা কোথায় তা অনুভব করতে পারবেন কী! অনুভব করতে হলে

হরের বাইরে যেতে হবে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপর পড়ে আছে রোদ। জায়গায়, গায়গায় গাছের জটলা। কোথাও রোদের প্রখর কিরণে ঝলসে যাওয়া কয়েকটি চালা াড়ি। বেড়ার গাছগুলি শীর্ণ হয়ে পড়েছে। পায়েচলা পথের পাশে ক্লান্ত দুর্বা। বড়ই রিশ্রান্ত একটি ছাগল। জলন্ত রোদে দূরে একপাল গরু ঘাসের সন্ধানে। তাদের সাদা রীর থেকে রোদের আরো জ্বলে জ্বলে বিকিরণে স্থানটি যেন অমরাপুরী! আরো রে সরকারি একটি বাঁধ। সেই বাঁধের ওপর দিয়ে সাইকেলে চলেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ম্পাউন্ডার। রোদে পোড়া বলিষ্ঠ চেহারা। এত ধীরে চলেছেন, যেন চাঁদের আলোয় ভিসারে চলেছেন। পরে আছেন আকাশী নীল রঙের জামা। মনে হচ্ছে ধাবমান কটুকরো নীল আকাশ।

একটি অশ্বত্থগাছ খুঁজে নিতে হবে। তার তলাটি যদি বাঁধান থাকে অতি উত্তম। শ্বত্থগাছের লোটা লোটা পাতা দুটো জিনিস ভারি ভাল ধরতে পারে। বাতাস আর মালো। রোদের আলো, চাঁদের আলো। রূপকথায় পড়েছি, রুপোর পাতা সোনার ল। অনেকটা সেই রকম। সেই ছায়ায় বসতে হবে। এপাশে ওপাশে ব্যস্ত াঠবেড়ালির অবিরত ঘুরপাক। বহুরকমের পিপড়ের ফ্ল্যাগমার্চ। কোথাও যেন দু' খলেই লড়াই চলেছে। অদূরেই গভীর শালবন। সবুজ পাতার ঘাগরা পরা দিঘ- ুন্দরী। গ্রীষ্মের কণ্ঠস্বর হল দাঁড়কাকের ডাক। জঙ্গলের সর্বোচ্চ বৃক্ষের ডালে বসে ালিশ করা কালো কাক ধাতব স্বরে ডাকছে ক্রাঙ্ক, ক্রাঙ্ক। চরাচরে ছড়িয়ে পড়ছে সেই ধ্বনি। যেন মোরামের রুক্ষপ্রান্তরের ওপর দিয়ে বেগে ছুটে চলেছে গ্রীষ্মের গ্নিরথের লোহার চাকা।

মাঝে মাঝে ওপর দিকে তাকান যেতে পারে। অশ্বত্থের শিথিল পাতার ঝালর গ্রীষ্মের নিঃশ্বাসে টিকলির মতো দুলছে। কোথাও বাতাসের প্রমাণ না থাকলেও অশ্বত্থের পাতায় থাকবেই। গ্রীষ্ম তার প্রতি বড়ই উদার। পাতার আড়ালে আড়ালে টুকরো ুকরো নীলচে আকাশ। আকাশ যেন স্থির এক মহাসমুদ্র। পরলোকের ইশারায় ভরা। ত বেলা বাড়বে বাতাস হয়ে উঠবে ঈষদোষ্ণ চায়ের লিকারের মতো। টাটকা বোলতা হলুদ বিষে ভরা আচমকা ভয় দেখাবে। কালো জামের মতো কালো ভোমরা কিছু একটার সন্ধানে ভেসে ভেসে বেড়াবে। খড়খড়ে গিরগিটিকে দেখলে মনে হবে এখুনি স্যালাইন চালাই। খরার প্রতীক।

খাঁকি পোশাক পরা বনবিভাগের কর্মী এসে অনেক দুঃখের গল্প বলবেন। শীতের শেষে আমের মুকুল এসেছিল অনেক। যদি হত, আড়াইটাকা কিলো হত। নিষ্ঠুর, রাগী এই গ্রীষ্মের রোষে সব শুষ্ক। গাছে গাছে ডাঁটা ঝুলছে। ওই দেখুন অতবড় একটা গাছে একটি মাত্র আম ঝুলছে। এমন কখনো হয়নি। ওই দেখুন চাষের জমি, দই ফাটা। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। মাঝে মধ্যে কালো কেউটে বেরিয়ে আসে

ঠাণ্ডার খোঁজে। সমস্ত পুকুর শুকনো। পুকুরের তলায় কি থাকে জানতে হলে এইবেল দেখে নিন। এমন সুযোগ আর পাবেন না।

পাখিরা সব গেল কোথায়?

পাখি দেখবেন?

বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে আলো ছায়ার পথ। তীক্ষ্ণ তীরের মতো সূর্যে কিরণ পাতা ভেদ করে নেমে আসছে। হাতের কঙ্কালের মতো উঁচিয়ে আছে মাটিতে ভেঙে পড়া শুকনো গাছের ডাল। বহু উঁচুতে উঁচুতে ঝুলছে বড়বড় তরিবাদি মৌচাক মৌমাছি জানে যত রোদ তত ঘন মধু। বড়বড় উইঢিবি শুকিয়ে ফুরফুরে। প্রখর উত্তাপে নবীন পাতাও খসেখসে পড়ছে। যত ছোটছোট কীট পতঙ্গ ছিল ভূমির উত্তাপে সব পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে।

কালভার্টের তলায় বিমূঢ়ের মতো শুয়ে আছে শুকনো নদীর শাখা। বর্ষায় ডুলু যখন জল পাঠাবে তখন আবার কলস্বনা হবে। আপাতত মৃত নুড়ি পাথরের প্রদর্শনী সেই কালভার্টের তলায় এক ঝাঁক শালিকের সরব সভা। যেন এইমাত্র দিল্লিতে এব ভোটে মন্ত্রীসভার পতন হল। বিধায়করা পরবর্তী জোটের জন্যে ঠোকরাঠুকরি করছে

জঙ্গল ভেদ করে আমরা একটি প্রান্তরে এসে পড়লুম।

কোথায় পাখি?

আরো একটু যেতে হবে। লাগছে কেমন? শরীর ঝলসে যাচ্ছে। তা যাক। এমন তাণ্ডব সহসা কি দেখা যায়! এমন চরিত্রবান গ্রীষ্ম! বনবিভাগের কর্মী বললেন, 'দেখুন দেখুন, চোখের সামনে মাটি কেমন ফাটছে?'

হিল হিলে বিদ্যুতের মতো কালো একটা রেখা এঁকে বেঁকে ভূমির ওপর দিয়ে চলে গেল। দুভাগ হয়ে গেল জমি। বসুন্ধরার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রকৃতি এত বিরাট, ক্ষুদ্র মানুষের ভয় লাগে।

এখানে এক সময় ছিল রাজশাসন। সেই আমলেরই জল টলটলে বিশাল এব দীঘি। কি অপূর্ব এক বিপরীত এক চিত্র। এতক্ষণ চোখ দুটো আগুনে ডুবে ছিল এখন নিমজ্জিত হল স্নিগ্ধ জলে।
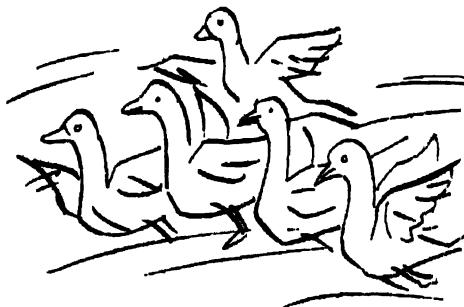
এক ঝাঁক ভাসমান হাঁস অন্তত পনের রকমের বক। প তুলে তুলে লেফট রাইট। বিশাল এক কুবো পাখি দুপাশে ডানা মেলে বাদামি একটা মোচার মতো পড়ে আছে ভিজে মাটিতে। বুলবুলির ঝাঁক আসছে, যাচ্ছে। বসন্ত বৌরি

ফিঙে, খঞ্জনা। এরই মাঝে রাজকীয় দুধরাজ। সাদা ধবধবে। লম্বা সরু লেজ। মাথায় কালো টুপি, কালো সরু ঠোঁট। একটি গাছের ডাল প্রায় জল ছুঁয়ে আছে। সেই ডালে বসেছে সুন্দরী। হঠাৎ উড়ে চলে গেল তীরের মতো। রোদঝলসান দ্বিপ্রহর ওদিকে কত নির্জন, এদিকে কত প্রাণ চঞ্চল! কত ওড়াউড়ি, ডাকাডাকি।

দীঘির পরপারে হাট বসেছে। ঝলসান রোদ আর গভীর ছায়া। মাটির হাঁড়ি রাগে সিঁদুরে বর্ণ। অর্থাৎ জব্বর পুড়িয়েছে। কলসি, সে তো লাগবেই। ঘরে ঘরে ধান্যেশ্বরী চোলাই হবে। আদিবাসী মেয়েরা আজকাল সিন্থেটিক শাড়ি পরে। তবে পছন্দের রঙ এই গরমেও লাল আর গোলাপি। চুলের বিনুনিতে সদা ফুলের মালা জড়ান। গরমকে এরা ভয় পায় না। বেতস শরীরে ছিটকে ছিটকে বেড়াচ্ছে। শুভ্র হাসি। কলকোলাহল। বাচ্চাদের ক্রন্দন। কাঁচা শালপাতার দোনায় হাড়িয়া খেয়ে ঝানু বৃদ্ধ অসংলগ্ন। এক যুবতী সিনেমা অভিনেত্রীর মতো ঘুরে ঘুরে নাচার চেষ্টা করতে গিয়ে টাল খাচ্ছে। বিলোল কটাক্ষে যখন তাকাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে— মারো গোলি পার্ক স্ট্রিট। শেক্সপিয়ারই সত্য –নেচারস ন্যাচারাল। এখুনি ছুটে গিয়ে বলতে পারি, মাই লাভ। তারপরই হাসপাতাল আমার পোস্টমর্টেম, বলো হরি। এদের বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি নিজেদের চরিত্রের গুণে। পার্ক স্ট্রিটের আধো-অন্ধকার বার কাম রেস্তোরাঁয় টেম্পারেচার এখন বারো কি ষোল। বাইরে বড্ড গরম, সেই সানসেটের পর একবার চেষ্টা করে দেখা যাবে বাইরে বেরনো যায় কি না। ভারি চেহারার সব ব্রোকার, বুকি, কালোয়াড়। বেশ কিছু 'সাকার', প্রখর ইন্টেলেকচ্যুয়াল কয়েকজন, কিছু প্রডিউসার, আর মেগাকাঙ্ক্ষী কিছু সুন্দরী। অল্প আলোয় পরিবেশ গুলজার। এই গরমে অ্যালকোহল, তন্দুরি, বিরিয়ানি, চাঁপ? আরে মশাই গরম কোথায়, এখানে তো সাবজিরো। বাইরেটা কেমন?

বাইরে থেকে ভেতরে এলে কিছুই দেখা যায় না, তারপর ভেসে ওঠে প্রেতের জগৎ। কবরের মৃত্যু শীতলতা। তাহলে জীবনের কাছে যাই। ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজারের সামনে রাস্তার ওপর প্যাকিং বাক্সে বসে আছে সুঠাম, সুন্দর এক যুবক। তার পণ্য, ছোট ছোট তোয়ালে, বালিশের ঢাকা. গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া। ঠাঠা রোদে বসে আছে। স্যান্ডো গেঞ্জি পরে। দুচার জন ক্রেতাও আছে! অনুমান করা যায়, যেখানে চাকরি করত, সেখানে ঝাণ্ডা উড়ে গেছে। পরিবারে মা আছে, বোন আছে, ছোট দুটি ভাই আছে। তিন বছর আগে বাবা মারা গেছেন ক্যানসারে। একটি মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা আছে। ছেলেটির নাম মনে হয় বিক্রম। বন্ধুবান্ধব ছিল, এখন তারা আর কথা বলে না। বিক্রমের মালিক বসে আছে পার্ক স্ট্রিটের সাবজিরোতে। মেগায় টাকা খাটাবে। ডিরেক্টার আজ একটি নতুন নায়িকা আনবে, তার নাম সেঁজুতি।

বিক্রম হাঁটুর ওপর একটি তোয়ালে ছড়িয়ে দেখাচ্ছে। মায়ের মতো এক মহিলা

ক্রেতা। পছন্দ হয়েছে। বলছেন, বাবা, এই রোদে বসে থাকবে সারা দিন! শরীরটা যে যাবে!

বিক্রম হাসতে হাসতে বলছে, মা, না বসলে আরো তাড়াতাড়ি যাবে।

প্রশ্ন করেছিলুম, বড়বাজারে যারা ধামার মতো পেট নিয়ে সারাদিন গদিতে কাত হয়ে থাকে, মাথার ওপর হোমিওপ্যাথিক পাখা ঘোরে, তাদের এই গরমে তো মরোমরো অবস্থা!

উত্তর হয়েছিল, কে বলেছে? ওদের শরীরতো রক্ত, মাংসের নয়, ব্যবসা দিয়ে তৈরি। সব এক একটি বর্তুলাকার ব্যবসা। তা বটে! কারো ধমনীতে তেল, কারো ধমনীতে লোহা। এদের ভাবনায় পৃথিবীটা একটা প্রোডাক্ট।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর দুপাশে আমাদের চার্নক সিটি। পশ্চিমে এই শহরের সবচেয়ে বড় নর্দমা, ভগবতী গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে। সারি সারি শ্মশান। ফুচকা ওড়াও, ভেলপুরীর ভেলকি দেখ, ঐতিহ্যমণ্ডিত কাটলেট কাট দাঁতে। বাগবাজারের দিকে তেলেভাজার ঐতিহ্য আজও বর্তমান। বিশাল চুলোয় কাঠ গোঁজা। বিরাট কড়ায় একালের অন্যতম আতঙ্ক—সরষের তেল। ঘর্মাক্ত লড়াইয়ের চপ, মা কালীর জিভের মতো লকলকে বেগুনি। সকালের দিকে সেই বিখ্যাত ফুলুরি। খাওয়া হয়ে গেলেই অন্তিম প্রশ্ন ফুরুলি!

লাঙস ভরে নাও কার্বন মিশ্রিত বাতাস। পেটে পুরে নাও কার্বন ডাই অক্সাইড মিশ্রিত ভুরভুরি বোতল জল। সেঁদিয়ে যাও কিনু গয়লার গলিতে। মানুষে মানুষে এত অসদ্ভাব, কিন্তু কি ঠাসাঠাসি বাড়ি! বাড়ির গায়ে বাড়ি, কি দোস্তি। এ বাড়ির কত্তা, শুনছ বললে, ও বাড়ির গিন্নি উত্তর দেয়. কি বলছ? এ বাড়ির গিন্নি বলে—আ মরণ!

স্বাভাবিক আলো নেই, এতটুকু বাতাস নেই, জমে আছে তিন শতাব্দীর স্যাঁত -সেঁতে শীতলতা। খাটের তলায় আর এক সংসার। খাটের ওপর চতুর্দশীর সংগীত সাধনা,

> বৈশাখ হে, মৌনী তাপস
> রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কি ওই যে তোমার বক্ষে দেখি
> ওরই লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে।।

মা, এখনো রবীন্দ্রনাথ!

আজ্ঞে হ্যাঁ! কালোয়ারি কালচারকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'প্রখর :পনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে, /বায়ু করে হাহাকার।' কে লিখবেন! রবীন্দ্রনাথকে রিয়ে নিলে থাকে কয়েক লক্ষ 'ফ্যাট বল', কয়েক কলসি ঘাম, অবিরল কলহ, অবিরত স্বার্থ, চিতা অনির্বাণ।

শ্মশানেও কি শান্তি আছে! বেলের মালায় পচ ধরেছে, গাঁদা গেছে নেতিয়ে। রজনীগন্ধা, কি দিবস, কি রজনী, সদাই কুঁড়ি অ্যান্ড নো গন্ধ! আর জবা! বলরে জবা বল, কোন সাধনায় হলিরে জমা, এমন চটচটে মুদিত বদন! মায়ের গলায় চড়ান মাত্রই নাকে লেডিজ রুমাল চেপে ধরেন। দুর্গন্ধ! পচা জবা আর পচা জীব একই রকম গন্ধ। তাহলে মা, তোমার গলার মুণ্ডমালা, আর তোমার হাতের কাটা মুণ্ডু! মা হেসে বললেন, গাধা, ও গুলো রিয়েল হলে তোদের মজাগঙ্গার ধারের এই ভাঙা মন্দিরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতুম পচা গদগদে জবার মালার জন্যে! প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যেতুম রে। দেখলি না, হওয়ার আগেই সনিয়ার গলায় আড়াইমণি মালা!

'না, আমার বউয়ের বাসনা ছিল চিতায় পুড়বে। তা বানারসী চিতা দিলুম। ন্লকে সাতফুট আগুনের শিখা কই?'

'আছে জ্যাঠামশাই, ঝলসানো রোদে ফুট চারেক গিলে নিয়েছে।'

ঠাণ্ডা ঘরে জোর মিটিং। মন্ত্রী বলছেন, 'গোলদার মশাই কি বলছেন, খরা?'

'না স্যার, মাত্র টু ডিগ্রি অ্যাবাভ নর্মাল!'

'কত ডিগ্রিতে খরা হয়! একটু খবর টবর নাও। বসে থাকলে হবে! জলটল আছে?'

'ওই তো আপনার সামনে গেলাসে চাপা।'

'লে হালুয়া!'

মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ

।। ক্ষমতাশালী মানুষের সঙ্গে কলহ করো না
বিপদ হতে পারে।।

।। ধনী মানুষের সঙ্গে বিবাদে যেয়ো না
তোমার সর্বনাশ করে দিতে পারে।।

।। কাঞ্চন অনেককে শেষ করেছে
বহু শাসকের চরিত্র নষ্ট করেছে সাবধান।।

।। বাচাল মানুষের সঙ্গে নাই বা কোঁদল করলে
নাই বা আগুনে চাপালে ইন্ধন।।

।। ইতর মানুষের আমোদে মেতে
পূর্বপুরুষের অসম্মান করো না।।

।। পাপের পথ থেকে যে ফিরে এল, তাকে ভর্ৎসনা করো না
মনে রেখো আমাদেরও সাজা হতে পারে।।

।। বৃদ্ধের অসম্মান করো না
একদিন সকলেই বৃদ্ধ হবে।।

।। কেউ মারা গেলে উল্লাস করো না
মনে রেখো সকলকেই মরতে হবে।।

।। বিজ্ঞ মানুষের আলোচনা অবহেলা করো না। তাঁদের প্রবাদ অনুসরণ করো।
সেই পথেই পাবে চলার নির্দেশ। শিখবে মহাপুরুষদের সেবা।।

।। বিজ্ঞ মানুষদের আলোচনা শুনতে ভুল করো না, কারণ তাঁরা যা বলছেন তা শিক্ষা করেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। সেই আলোচনায় তোমার বোধের বিকাশ ঘটবে। তোমার প্রয়োজনে তুমি তখন নিজেই সমাধান খুঁজে পাবে।।

।। পাপীর পাপের আগুন উস্কে দিও না
সেই আগুনে তোমার নিজেরই পুড়ে যাওয়ার ভয় আছে।।

।। তোমার চেয়ে যে বলবান তাকে ধার দিও না
যদিও দাও তো মনে কোরো টাকাটা হারিয়ে ফেলেছ।।

।। নিজের সঙ্গতি বুঝে জামিন দেবে
মনে রেখো, টাকাটা হয়তো তোমাকেই দিতে হবে।।

।। কখনও কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা করতে যেও না।
জেনে রাখ তাঁর পদমর্যাদার কথা ভেবে আইন হয়তো তাঁর দিকেই যাবে।।
।। বেপরোয়া মানুষের ভ্রমণসঙ্গী হয়ো না। অনেক বোঝা
তোমার ঘাড়ে চেপে যেতে পারে, অনেক ঝুঁকি। কারণ সে তো যা খুশি
তাই করবে, আর তার ভুলের মাশুল তোমাকেই দিতে হবে।।
।। বদরাগী মানুষের সঙ্গে লড়তে যেও না। তার সঙ্গে নির্জনস্থানে
ভ্রমণও তোমার পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ যখনতখন রক্তপাত তার কাছে
কিছুই নয়। আর যেখানে তৃতীয় কেউ নেই সেখানে তোমাকে এক কোপে
সাবাড় করে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই নয়।।
।। বোকার কাছে পরামর্শ নিতে যেও না; কারণ সে তোমার বিষয়ের
গোপনীয়তা রাখতে পারবে না। সব্বাইকে বলে বেড়াবে।।
।। অপরিচিতের উপস্থিতিতে গোপনীয় কিছু করো না।
এর পরিণতি কি হতে পারে তোমার জানা নেই।।

এইসব প্রবাদ অতি প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এর রচনাকার প্যালেস্টাইনের অধিবাসী ছিলেন। এইটুকুই জানা গেছে। তাঁর এই প্রবাদমালাকে ল্যাটিনে বলে — 'ইকলেসিয়াসটিকাম'। তিনি লিখেছিলেন 'হিব্রু'-তে। ভাষা হিব্রু হলেও ভাব 'হেলেনিক', গ্রিক রীতিনীতির প্রভাবপুষ্ট। ১৮৯৬ সালে কায়রোর এক 'সিনাগগ' থেকে এঁর পাণ্ডুলিপির টুকরো আবিষ্কার হতে থাকে। নানা কারণে এই অপূর্ব প্রবাদমালা 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' স্থান পায়নি। কারণ একটাই, ধর্মীয় ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েকটি বিপরীত ভাব—সুখের অনিশ্চয়তা, বন্ধুদের অবিশ্বাস্যতা, সর্বোপরি নারীদের ছলনাময়িতা। এই জ্ঞানী মানুষটির নাম ছিল— জেসাস বেন সিরাক।।

শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। সেদিন দুর্গাপূজার সপ্তমী। কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেখানে উপস্থিত। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন ঃ

'এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়! প্রথম, বড়মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে; তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে সায় দিয়ে যেতে হয়! তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও তাহলে বলবে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন— বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুশি হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।

'অসৎ লোক এলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে।'
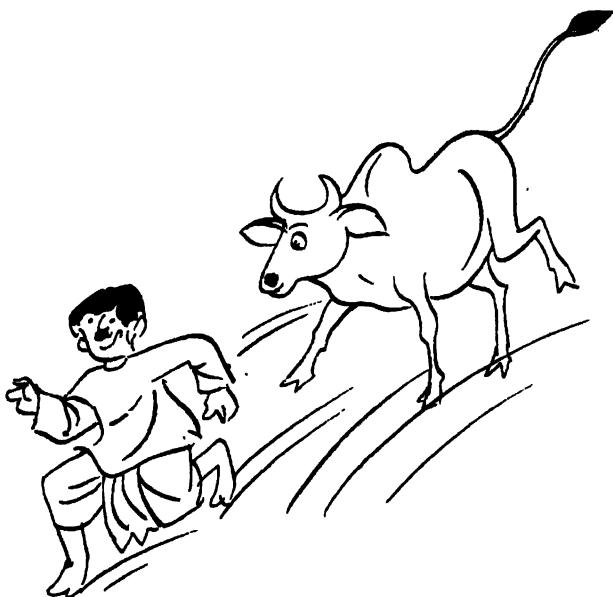
'কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার উপায় বলছেন, 'মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।'

সব মানুষই মত্ত। ছুটছে। সামনে ছুটছে সোনার হরিণ, কাম আর কাঞ্চন। ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। এদেরই মাঝে যুগে যুগে বন্ধুমানুষ এসে পথের পাশে দাঁড়িয়েছেন সত্যের পতাকা হাতে। একটি কালজয়ী জাপানি প্রবাদ:

Wisdom and virtue are like the two wheels of a cart.

'কলিং বেল'

কলিং বেল
দরজা খুলতে এগোচ্ছেন
আধুনিকা গৃহিনী।।

সামনেই দুই ভদ্রলোক

ভদ্রলোকদ্বয় : আসতে পারি?

মহিলা : কে আপনারা?

উত্তর : আমরা আসছি ফ্রম ডোম্যাস্টিক এডস ইনকরপোরেটেড। একটি সমাজসেবী সংস্থা।

মহিলা : আসুন। তবে বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কী? কাপড়কাচার পাউডার? ভ্যাকুয়াম ক্লিনার? ওয়াশিং মেশিন?

উত্তর : ওসব বাজার চলতি ব্যাপার নয় ম্যাডাম। আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। সেন্চুরি টপ্‌কে গেছি। একেবারে নিউ আইডিয়া।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক : আমি বলছি। একেবারে জলবৎ তরলং করে দিচ্ছি। আমরা বসতে পারি ম্যাডাম?

মহিলা : হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন।

তিনজনে বসলেন

দ্বিতীয় : ব্যাপারটা হল—আপনার ইচ্ছে আছে উপায় নেই, যেমন ধরুন মোচার ঘন্ট খেতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু মোচা কাটতে জানেন না। জাস্ট লিফটি দি ফোন, ডায়াল, ফোর ফোর সেভন নাইন এইট নাইন। অপেক্ষা করুন। ক্যাট ক্যাট ক্যাট ক্যাট। লাল মোটর সাইকেল। আমাদের কর্মী যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির। আপনার নিজের বঁটি না থাকলেও চলবে। পনের মিনিটের মধ্যে মোচা ড্রেস করে দিয়ে চলে যাবে। একেবারে

ক্লিন জব। ফর্মূলা জানা না থাকলে সেটাও দিয়ে যাবে। কতটা ছোলা, নারকোল কোরা কতটা। বাকিটা আপনার পার্সোনাল টাচ। ইউ গেট ইওর মোচার ঘন্ট।

প্রথম : ধরুন ইচ্ছে হল, থোড়ের ছেঁচকি। ভয়ঙ্কর জিনিস। একেবারে লোহার কারখানা। অ্যানিমিয়ার যম। এক এক ফোঁটা রস মানে গোটা একটা লোহার ডান্ডা, কিন্তু কে কাটবে। লাস্ট সেনচুরির শাশুড়ীকে তো খেদিয়ে দিয়েছেন। থোড় আবার সুতো কল। একটা করে চাকা কেটে আঙুলে সুতো জড়াতে হয়। আধ্যাত্মিক জিনিস। জপের মালার মতো একশো আটবার জড়াতে হয়। ঘোরাচ্ছেন, ঘোরাচ্ছেন আর বীজমন্ত্র জপ করছেন। এক ফুট থোড় মানে এক হাজার জপ। পারবেন আপনি? আপনার এই নেলপালিশ লাগানো সোনার আঙুল কালো হয়ে যাবে। লিফ্‌ট ইওর ফোন, ডায়াল আওয়ার নাম্বার। আধঘন্টার মধ্যে শুদ্ধ সাদা কাপড় পরা এক বৃদ্ধা এসে যাবেন। দীক্ষিতা। বউমা, বলে বসে পড়বেন। এক এক চাকা কাটবেন, আর এইভাবে আঙুলে সুতো জড়াবেন। থোড়ের সুতো। জপের তালে তালে।

মহিলা : কিন্তু আমি ওইসব রাবিশ থোড়, মোচার লাইনে যাব কেন?

দ্বিতীয় : ওতে আপনার গ্ল্যামার বাড়বে। সারপ্রাইজ ডিশ সার্ভ করবেন গেস্টদের। লোকে বাহবা বাহবা করবে। বলবে, আপনি ডয়েন অফ বঙ্গ সংস্কৃতি। লুপ্তপদ উদ্ধার করছেন।

প্রথম : এইবার ধরুন রাতে লুচি, রুটি, পরোটা খাবেন, আমরা আপনাকে ময়দার তাল সাপ্লাই করব। ময়দা ঠাসার বিরক্তিকর জঘন্য কাজটা আর আপনাকে করতে হল না। ওই সময়টায় আপনি টিভি সিরিয়াল দেখলেন।

দ্বিতীয় : লুচি, রুটির গোলটা আপনার আসে না। চাকিবেলনে আপনার হাত খেলে না। লজ্জার কিছু নেই। আমাদের কর্মী এসে সটাসট মাল নামিয়ে দেবে।

প্রথম : চারা মাছের ঝোল খানে। মাছের অ্যানাটমি আপনি জানেন না। আমাদের ডিসেক্টার এসে ফুলকা-পিত্তি অপারেশান করে দিয়ে যাবে। হলুদ, নুন মাখিয়ে আপনার গ্যাসের টেবিলে রেখে যাবে।

দ্বিতীয় : ধরুন, আপনার ইচ্ছে হল, হোম মেড বড়ি খাবেন। একটা লুপ্ত শিল্প। কাঁথা, বড়ি, কাসন্দি। মালপো, পুলি পিঠে, সরু চাকলি। আপনার ইচ্ছেটা শুধু টেলিফোনে জানান। আমাদের পালোয়ান সেকসান থেকে এক পালোয়ান এসে ডাল বেটে দিয়ে যাবে। আপনি ছাতে বসে সারাদিন টুপুস, টুপুস করে বড়ি দেবেন। আপনারা স্বামী অবাক হয়ে ভাববেন-এ আমার আধুনিকা বউ না প্রাচীনা কোনো শাশুড়ী! একই অঙ্গে এত গুণ দেখিনি তো আগে! (সুরে)

প্রথম : আমাদের পার্সোন্যাল সেকসান আছে। যেমন ধরুন, আপনার খুব কাশি হয়েছে কিন্তু কাশতে ইচ্ছে করছে না। আমাদের পার্সোন্যাল সেকসানের কর্মী আপনার পাশে সর্বক্ষণ থেকে কেশে দেবে। তাকে শুধু একবার মাত্র কেশে দেখিয়ে দেবেন, আপনার কাশির ক্যারেকটারটা কী—খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ না খক্ খক্না, ঘংঘং।

দ্বিতীয় : পাশের ফ্ল্যাটের মুখরা বউ, কি আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনি ঝগড়ায় এঁটে উঠতে পারেন না, আমরা উকিল দেওয়ার মতো আপনাকে একজন প্রতিনিধি দোবো, শুধু ইস্যুটা ধরিয়ে দেবেন, ঝগড়া করে ফাটিয়ে দিয়ে যাবে।

প্রথম : আপনার ছেলে, মেয়ে হয়েছে?

মহিলা : হয়নি।

প্রথম : আহা! হবে তো! ভয়ঙ্কর কোনো স্কুলে ভর্তির চেষ্টা এখনই করতে হবে। অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে উজ্জ্বল বর্তমান। আমাদের মুরুব্বি সেকসান আপনাকে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় : সেখানে প্যানেল অফ মুরুব্বিজ মোতায়েন আছে—স্কুলে অ্যাডমিসান, ট্রেনে, প্লেনে অ্যাকোমোডেসান, ভাড়াটের বিরুদ্ধে লিটিগেসান, গ্যাসের একস্ট্রা সিলিণ্ডার, সুন্দর জায়গায় সরকারী ফ্ল্যাট, তিন দিনে পাসপোর্ট, একদিনে টেলিফোন লাইন, কাজের লোকের রেশান কার্ড, সবই আমাদের বিভাগীয় মুরুব্বিরা করে দেবেন। জাস্ট লিফট দি ফোন অ্যান্ড ডায়াল আওয়ার নাম্বার।

প্রথম : আপনার বাড়িতে আর কে আছেন?

মহিলা : আমার বৃদ্ধ শ্বশুর।

প্রথম : মারা যাবেন তো।

মহিলা : যেতেই পারেন। বয়েস হয়েছে।

দ্বিতীয় : নিয়ারেস্ট কোনটা? আই মিন বার্নিংঘাট।

মহিলা : কেওড়াতলা।

প্রথম : কতক্ষণ সময় দেবেন ফর পোড়ানো। লাইন দেখেছেন ডেডবডির লাইন। পুড়তে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, ঢোকাতে পাঁচঘন্টা।

দ্বিতীয় : আমরা মুরুব্বি ধরে ডেডবডি টপকে দিতে পারি। যাবেন, ঢোকাবেন, ছাই নিয়ে চলে আসবেন।

প্রথম : আচ্ছা, আমরা তাহলে আসি ম্যাডাম। এই আমাদের কার্ড। ডোম্যাস্টিক এডস ইনকরপোরেটেড।

জাস্ট লিফট দি ফোন অ্যান্ড ডায়াল ফোর ফোর..

দ্বিতীয় : সেভন নাইন এইট নাইন

প্রথম : (হেসে) বাট দি ফোন ইজ ডেড।

চাঁদের আলো

একবার একটা জায়গায় গিয়েছিলুম বেড়াতে। তীর্থস্থান। দূরে একটা আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। ইশারায় কাছে ডাকে। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচীন এক বাংলোয়। বাংলোটার নাম জর্জেস কোয়ার্টার। জর্জ নামে এক জার্মান সাহেব এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এই পাহাড়ী শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। পেশায় ছিলেন ডাক্তার। বিহারের এই অনুন্নত অঞ্চলের জনজীবনের সঙ্গে তিনি মিশে গিয়েছিলেন। সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। দরিদ্র মানুষদের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ঈশ্বরকে। একটা সাইকেল চেপে পল্লীতে পল্লীতে নিরন্ন, দুঃস্থ মানুষদের চিকিৎসা করে বেড়াতেন। নিজের ইওরোপীয় জীবনের যাবতীয় বিলাস, ব্যসন, কেটে ছেঁটে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মতো করে ফেলেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে বাংলো ও তৎসংলগ্ন উদ্যান একটি আশ্রমকে দান করে দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন জর্জসাহেব।

সেই জর্জকুঠিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় ভুতুড়ে একটি বাড়ি। পাঁচিল ঘেরা নিরালা সামান্য একটি আবাসস্থল। ভেঙেচুরে গেলেও ভেঙে পড়েনি, কারণ সেকালের গাঁথনি। চল্লিশ ইঞ্চি দেয়াল। চুন, সুরকির গাঁথনি। উদ্যান আগাছায় ভরে গেলেও কিছু কিছু ফুলগাছ ফুল ফুটিয়ে বসে আছে। সুন্দর একটি উঠান পাঁচিলের অন্তরালে বুক পেতে রেখেছে। অনুচ্চ একটি দাওয়া তারপরেই মাঝারি মাপের একটি ঘর। নোনাধরা দেয়াল। অনবরতই বালি ঝরছে চুরচুর শব্দে। বাংলোয় আসার পায়ে চলা পথটি বড় বড় ঘাস আর আগাছায় কখনও প্রকাশিত কখনও অপ্রকাশিত এক লুকোচুরি! সাপ আছে। দিনে তেমন ভয় নেই। রাতে সাবধানতার প্রয়োজন।

রাতটা যে এত ভয়ংকর হবে দিনের বেলায় বুঝিনি। আশ্রম মন্দির অনেক দূরে। লোকালয় আরও দূরে। গাছপালা আর পোড়ো বাংলোর নির্বাসনে আমি একা। সেই সময়টায় চলছিল চাঁদের আলোর রাত। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশের সব ধুলো ধুয়ে গিয়ে নীল নির্মল। চাঁদ প্রায় পূর্ণিমার প্রান্তে। গাছের মাথায়, আকাশ প্রান্তরে আলোর প্লাবন। ঘুম আর আসে না। একে জায়গা নতুন, তার ওপর দুঃসহ সেই নির্জনতা। আমার থাকার ব্যবস্থা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা এই নির্জনতার ওপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, নিরালা অবস্থানে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া 'আমি'টা-কে খুঁজে পাব।

কোথাও কেউ নেই। বসে আছি একা। চাঁদের আলো চরাচরে বেড়িয়ে ফিরছে। নির্জনতা ভাল, কিন্তু এতটা কি ভাল! হায়! একেই বলে, উল্টা বুঝলি রাম! আশেপাশে চোর-ডাকাত অবশ্যই নেই, তবে অশরীরী উপস্থিতির অনুভূতিতে মন পালাই পালাই করছে। বিজ্ঞান ভূত না মানলেও আমি মানি। দু-একবার দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। সেই দর্শনের আতঙ্ক বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে সেই মুহূর্তে দূর করতে পারিনি।

দ্বিতীয় কোনও উপায় না দেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম রকে। যা হবার তা বাইরেই হোক। বাইরেটাকে বাইরে রাখলে ভেতরটা ভয়ে কুঁকড়ে মরে। সামনেই সেই বাঁধানো উঠোন। ফেটে ফেটে গেছে। ফাটলে ফাটলে গাছের চারার উঁকি ঝুঁকি। একটু ঘাস, একটি কচি বট, পাথরকুঁচি, তুলো ঘাস। প্রাচীর ঘেরা সেই প্রশস্ত উঠানে লুটিয়ে আছে অকৃপণ চাঁদের আলো। চন্দ্রালোকের নির্জন একটি হ্রদ যেন। আমি বসে আছি একা সেই হ্রদের কিনারায়। মধ্যরাতের সুষুপ্ত পৃথিবী। মাথার ওপর তারার জলসা। শিকারী কালপুরুষের মৃগয়া। হঠাৎ একটা অনুভূতি এল। মনে হল, ওই অবলুণ্ঠিত চাঁদের আলো, আমার মা, বহুকাল আগে যে-মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, স্নেহহীন, প্রেমহীন এই পৃথিবীতে আমাকে একা ফেলে রেখে। স্নেহের আঁচল বিছিয়ে এই নির্জনে তিনি আমাকে ডাকছেন যেন, 'খোকা, আয়, আয়, তোর যত তাপ উত্তাপ সব জুড়িয়ে দি, বড্ড পুড়ে গেছিস।'

অন্তে চিতায় শয়ন

কার না ইচ্ছে করে বেশ একটু খেলিয়ে, কালোয়াতি করে বাঁচতে। যেমন নিজের ছোট হলেও ছিমছাম মাথা গোঁজার মতো একটা আস্তানা। না হয় কাঁচাই হল। বাবুই পাখির মতো চড়াইদের বলব— কাঁচা হোক তবু ভাই নিজেরই বাসা। চারপাশে আর তিন ঘর ভাড়াটের মধ্যে স্যান্ডউইচ মেরে থাকতে হয় না। রোজ প্রাতঃকালে কমন বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে লেবার পেনের রমনীর মতো ডেলিভারি প্রায় হয়ে গেল বলে ছটফট করতে হয় না। নিজের মালিকানার বাথরুম। সাহস করে যা-তা খাওয়া যায়, যখন খুশি ঢোকা যায়। পেঁয়াজি খেতে পারি, কাঁঠাল খেতে পারি, ছোলার ডাল, লুচি। সব সময় দরজা, জানলায় পর্দা ঝোলাতে হয় না বেআব্রু হওয়ার ভয়ে। মাঝ রাতে পাশের ঘরে বিড়ি ফোঁকা করে কেউ দমকা কাশি কাশবে না। বউ পেটানোর নাকি কান্না শুনতে হবে না। শাশুড়ী বউয়ের চুলোচুলির নীরব সাক্ষী হতে হবে না।

নিজের বাড়ি, লাল মেঝে। দক্ষিণ খোলা শোয়ার ঘর। একটা ইংলিশ স্টাইলের খাট। টান টান বিছানা। কমলা রঙের পর্দা। জানলার কাছে টেবিল। একটা মনোরম বসার ঘর। এক চিলতে কার্পেট। কাঁচ লাগানো সেন্টার টেবল। হালকা ধরনের গোটা তিনেক সোফা। একটা বুক কেস। মনের মতো শ'দুয়েক বই। ছোট একটা শোকেসে কিছু পুতুল। গোটা দুই কফি মাগ। একটার গায়ে লেখা, মর্নিং কিস। আর একটার গায়ে, লেটনাইট অ্যাফেয়ার। সবই অপ্রয়োজনীয় শোভা। পাহারাদারের মতো খাড়া একটা টেবল ল্যাম্প। মাথায় তার তুর্কী টুপী।

ছোট কিন্তু আধুনিক একটা রান্নাঘর। খোপে খোপে সুন্দর করে সাজানো এক মাপের সব কৌটো। কৌটোর গায়ে লেবেল মারা। চা, চিনি, সুজি, পোস্ত, আটা, ময়দা, নুন। একটা 'অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস' গ্যাসবার্ণার। মহাদেবের মতো সদা অকুণ্ঠ গ্যাস সিলিন্ডার। ছাই ছাই রঙের মৃদু গীত গায়ী সদা শীতল সুগৃহিনীর মতো একটি রেফ্রিজারেটার। অভ্যন্তর ভাগে যাবতীয় সুখাদ্য। দরজাটি খোলামাত্রেই হিমালয়। তপস্বীর মতো একপাত্র রসগোল্লা। জমাট সমাধিমগ্ন দধি, অমলিন একডজন কুক্কুটি আণ্ডা। স্নেহশীতল একখণ্ড মাখম। শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের আঁকা আপেলের মতো একদল কাশ্মীরী তরুনী আপেল। ত্বক যৌবনা মুসুম্বি গুটিকয়। সুখ ও সমৃদ্ধির শিশির মণ্ডিত একটি ছবি।
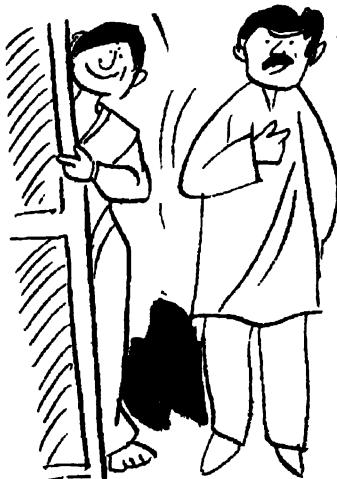
কয়েকদিন হল বাড়িতে এসেছে রুমি। সৌম্যের কথা ওর মনেই ছিল না। তবু ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় চোখ পড়ে গেল। চিরদিন পড়ে এসেছে। আজ ব্যতিক্রম হবার নয়। কিন্তু মুহূর্তের পলকহীন চাউনি ওর শরীর কাঁপিয়ে দেয়। দম আটকানো গলায় আস্তে উচ্চারণ করে, সৌম্য না?

জানলা দিয়ে সৌম্যকে পরিষ্কার ও দেখল। একটা বিস্ফোরণের উত্তেজনায় চনমন করছিল রুমি। ওর হাত পা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

সৌম্য রুমিকে দেখে দরজা খুলে দেয়। ভেতরে ঢুকে রুমি খাটে বসে পড়ে। সৌম্যকে খুঁটিয়ে দেখে। কত বছর পর এই দেখা! ঠিক মনে করতে পারে না। ভারি গোঁফ, মোটা চেহারায় সৌম্য পুরোপুরি কেতাদুরস্ত মানুষ। রুমিকে দেখে খুব সহজভাবে সৌম্য বলল— কি ব্যাপার রুমি? কবে এলে?

— তিন চার দিন হল।

— ভাল আছ?

—আছি। তুমি? পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে রুমি।

— এই আছি একরকম। আমাদের থাকা! কাঁধ উঁচিয়ে কেতাবি উত্তর দেয় সৌম্য।

এতদিন বুকের ভেতর প্রচ্ছন্ন ও সতর্কভাবে যে ভালবাসার চারাগাছ বসানো ছিল সৌম্যের কথাবার্তায় তা কেমন ঝুরো আলগা হয়ে যায়। ওর মনে হয় এক শব্দহীন স্বপ্নের ট্রেন থেকে সে যেন মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে।

সৌম্যের দিকে কয়েক মিনিট চুপচাপ তাকিয়ে থাকে রুমি। ওর ভাবলেশহীন মুখের ভাষা ঠিকঠাক পড়ে উঠতে পারে না। ও খোঁজে সৌম্যের ভেতর আর এক সৌম্যকে। দস্যিদামাল যে ছেলেটা আগাছার বনের ভেতর ওর মনে প্রেমের বীজ বুনে দিয়েছিল।

সেই ছেলেটা কোথায় হারিয়ে গেল? সৌম্যকে সামনে পেয়েও সেই দুরন্ত ছেলেটাকে খুঁজতে থাকে রুমি। কিন্তু পায় না। তবু রুমি খুঁজে যায়। খুঁজতে থাকে।

গুরু হরেক রকমের

এক এক সময় এক একটা জিনিস খুব বাড়ে, যেমন শীতে হাঁপানি বাড়ে। বর্ষায় বাড়ে পেটের গোলমাল। ইদানীং বেড়েছে সভা-সমিতি, পুজোর উদ্বোধন। ঘণ্টা নাড়ার জন্যে পুরোহিত। রান্নার জন্যে হালুইকর। উদ্বোধনের জন্যে সাহিত্যিক, নেতা, চিত্রতারকা, খেলোয়াড়। খুব ইনফ্লুয়েন্স থাকলে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চ একেবারে জমজমাট। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি, সম্মানিত অতিথি। যতভাবে বাড়ানো যায়, বাড়িয়ে যাও।

যুবশক্তি জেগে উঠেছে। 'রক্ষা নাহি আর'। অন্য সময় যুব-সাজ হল ব্যাগি। ব্যাগি কি বস্তু। বিদেশী আমদানী। বস্তা টাইপের একটা জিনিস নিম্নাঙ্গে, নৌকোর পালের মতো একটি ঊর্ধাঙ্গে। যেন দু'পায়ে দুটো ফানুস। পায়ের গাঁটের কাছে কাপ মেরে আছে। যেন দুটো বিরাট আকৃতির উল্টোনো বোতল। কোনো উপমাতেই সে-জিনিসের মহিমা প্রকাশ করা যাবে না। ব্যাগি ট্রাউজার। কোমরের কাছে কুঁচি মারা। তিন কোঁচ, সাত কোঁচ. সাতাত্তর কোঁচ। পরিহিতদের দেখে গান গাইতে ইচ্ছে করবে, সাধের লাউরে। লাউবাবু চলেছেন নিতম্বের বিলাস নিয়ে। ব্যাগি-শার্ট দেখলে মনে হবে, পাল তুলে দে, নৌকায় পাল তুলে দে। এই রকম একটি বিচিত্র বস্তু, একালের যুবক। ফিটিংসের যুগ চলে গেছে। ফিটফাট বলার উপায় আর নেই। বিজ্ঞাপনে বলা হত, নাতি খায়, দাদু খায়। এ পোশাক নাতি পরে, দাদু পরে। সকলের জন্যে, গণতন্ত্র-পোশাক। ফর দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপ্‌ল, অফ দি পিপ্‌ল। একজনের ভেতর দু'জন ঢুকে যেতে পারে। পরে কত্থক নাচ নাচা যায়।

কিন্তু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্য সাজ। চুস্ত পাজামা. চিকনের ধাক্কা মারা লবেজান পাঞ্জাবি। ওলিম্পিক বা আন্তর্জাতিক স্পোর্টস-এ পদক নাই বা পেলুম, এখন গলায় গলায় মহাপুরুষ আর দেব-দেবী লকেট হয়ে দোল খাচ্ছেন। বুকের মিহি ঘামে ট্যালকাম

পাউডারের আলপনা, লোমের কুশাসনে তাঁদের দম আটকে যাওয়ার অবস্থা। ভাগ্যিস. ভগবানের শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। তিনি বকলমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। আমরা পুরুষকার ছেড়ে ভাগ্যকে চেপে ধরেছি। কর্ম ছেড়ে ধর্ম ধরেছি। মহামানব আর গুরুর আশ্রিত। বারোয়ারি আমাদের তপস্যা। চাঁদা করে ধোলাই আর চাঁদা করে বারোয়ারি এই আমাদের কর্ম।

এক একটা যুগ আসে চলে যায়। সপ্তদশ শতককে বলা হয়, এজ অফ এনলাইট্‌মেন্ট। আলোয় আলোকময়। অষ্টাদশ শতক হল, এজ অফ রিজন। যুক্তি, তর্ক, বিচার। উনবিংশ শতক হল, এজ অফ প্রগেস। প্রগতি। বিংশ শতাব্দী হল, এজ অফ অ্যাংজাইটি। কেবল দুশ্চিন্তা। আমাদের রাজ্যে হল, এজ অফ গুরু। কত রকমের গুরু যে মার্কেটে ছাড়া পেয়েছে। শিক্ষাগুরু, সঙ্গীত গুরু, অস্ত্র গুরু, সিগারেট গুরু. বোতল গুরু, ধর্ম গুরু। আকাশে-বাতাসে ধ্বনি-তরঙ্গ, গুরু গুরু। খুব আদরে, সুমহান আবেগে, গুল গুল। আসরে গুরু, সিনেমার পর্দায় গুরু, চায়ের দোকানে গুরু। রাস্তায় সহ-অবস্থান গুরু আর গরু।

গুরু বোম বাঁধছেন, অ্যাকসান হবে
গুরু লরি থামিয়ে চাঁদা তুলছেন।
মা কালীর পুজো হবে।
গুরু চেলা নিয়ে খুলেছেন রসের ভিয়েন
প্রশাসন দুঃশাসন পালিয়ে বেঁচেছেন।।

শিক্ষাগুরু

বসে আছেন তিনি হাতল-ভাঙা চেয়ারে। স্কুল আর কলেজ একই হাল। নরক. নরক খুঁজিস কোথায়, নরক আছে এইখানে। অ্যাতো আবর্জনা! আজ্ঞে হ্যাঁ! এর নাম 'স্কল্যাস্টিক গার্বেজ'। বর্ষে বর্ষে, দলে দলে এসেছে, স্মৃতিটুকু ফেলে চলে গেছে। এ তো সরানো যাবে না। এই তো সত্য-- ট্রুথ। Dust thou art. to dust returnest জঞ্জাল দাউ আর্ট, টু জঞ্জাল রিটার্নেস্ট। এ-জাত আর হাতে ঝাড়ু ধরবে না, ঝাড় এখন মুখে। ঝাড়ু এখন কথার ফুলঝুরি। বন্ধুগণ! বলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবো, গলার শির ফুলিয়ে কয়েক গ্যালন বক্তৃতা ঝাড়বো। সব সাফা। এখানে সঞ্চিত আছে অতীতের জঞ্জাল, বর্তমানের জঞ্জাল, ভবিষ্যতের জঞ্জাল। জাতির ইতিহাসের মাল-মশলা ঐতিহাসিক চিমটে হাতে বসবেন উবু হয়ে। সার্চিং ফর ট্রুথ। এনিথিং এলস? আর কোনো প্রশ্ন!

অধ্যক্ষ মহাশয়! আপনার আসনের এই দশা কেন?

বৎসে! ইহারই নাম দশ দশা। তুমি কি জানো দশ দশা ককে বলে?

একটাই জানি স্যার! দুর্দশা, যা ভুগে আসছি চিরটা কাল।

তুমি স্যার বলছ? অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি। শোনো, স্ত্রীদের কাছে সব স্বামীর এক নাম, 'শুনছো।' কারণ স্বামীরা শোনার জন্যে জন্মায়, স্ত্রীরা বলার জন্যে। আর কলেজে আমরা সব আদ্যাক্ষর, টিজি, ভিসি, এসি, বিসি, সিএম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি। শোনো ছাত্ররা আর স্যার বলে না। মাঝে মধ্যে ষাঁড় বলে আদর করে। যাক্, তুমি যখন আগ্রহী, তখন দশ দশাটা শিখিয়ে দি। দশ দশা হল, মনের আর জীবনের। মনের দশ দশা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মরণ। জীবনের দশ দশা—গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থবিরতা, জরা, প্রাণরোধ, মৃত্যু। এই চেয়ারের ওপর পৌগণ্ডলীলা হয়েছে। ওই যে জানালার শার্সির ভাঙা কাঁচ, পাখার দোমড়ানো ব্লেড, এ সবই হল আন্দোলনের সাক্ষী। প্রশ্নের উত্তর দাও,

ব্যাং কোথায় জন্মায়?

ডোবায়।

রাজনীতির ব্যাঙাচি জন্মায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। লণ্ডভণ্ড করে, চেয়ার টেবিল ভেঙে, আমাদের পিটিয়ে, চাঁটা মেরে একলাফে রাজনীতির ব্যাং। তারপর এলেম থাকলে কোলা ব্যাং। আমাদের গর্ব কোথায় জানো? কে কতবার কতক্ষণ ঘেরাও হয়ে থেকেছি। কে কিভাবে কতবার ধোলাই হয়েছি। আমরা এখন ছাত্রদের স্যার বলি। পুলিস যেমন সমাজবিরোধীদের স্যার বলে স্যালুট ঠোকেন। বেশি হম্বিতম্বি করলে দাদাকে বলে, এমন থানায় ট্রান্সফার করে দোবো রাবড়ি খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ফুল্কো লুচি, কচি পাঁঠা। ছাত্ররাই এখন আমাদের শিক্ষক।

আমাদের যদি আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছে হয় তাহলে এই ভাবে লিখব, তাঁরা আমাকে চেয়ারে বসালেন; মাথার ওপর রাজনীতির ছাতা ধরলেন, যেই নিজের মত খাটাতে চাইলুম, একটু শাসন করার অহঙ্কার এল, অমনি তাঁরা ফেলিয়ে দিলেন। প্রথমে হাতল গেল, তারপর পায়া গেল। শেষে মাটিতে। ব্রহ্মতালুতে চাঁটা মেরে ঢুকিয়ে দিলে পাতালে। শিক্ষার পাতাল প্রবেশ। কলেজ, ইউনিভার্সিটি এখন ওয়ার্কশপ। যখন মুক্তি পাবো, তখন কানে শুনিনা। স্লোগানে, স্লোগানে কালা। চোখে দেখি পোস্টার। কাতারে কাতারে অভিভাবক আর ছাত্র চিৎকার করছে, রেজাল্ট, রেজাল্ট। খাতা হাওয়া খাচ্ছে ট্রামে। অ্যাভারেজের কেরামতিতে ভাল ভাল ছেলেদের কেরিয়ার খতম। একালের ভোকাবুলারিতে ফুটুরডুম। আমরা সবাই গুরু এই গুরুর রাজত্বে।

বাম্পার

তুমি কে? আমি একটা মানুষ। কেমন মানুষ? মধ্যবিত্ত মানুষ। এইটাই কি তোমার পরিচয়? আজ্ঞে হ্যাঁ। মানুষ হল অর্থনৈতিক জন্তু। টাকাতেই সব পরিচয়। অর্থহীন মানুষ জন্তুর সমান। পৃথিবীর আবর্জনা বিশেষ। তখন সমর্থই তার একমাত্র সম্বল। তখন একটাই প্রশ্ন, খাটতে পারো? তাহলে দুবেলা দুমুঠো জুটবে। রেলের কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে বিশ্রী, কর্কশ গলায়, অ্যায়, কুলি!

স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সব কথার কথা, লিখতে হয় লেখা, বলতে হয় বলা। স্বাধীন দেশের একটা মানুষ আর একটা মানুষকে ক্ষমতার গলায় ডাকছে, অ্যায় কুলি! তার মাথায় একের পর এক ঢাউস ঢাউস কটা ব্যাগ চাপান হল। এক কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা কাঁধ ব্যাগ। লোকটি যাবে, পা বাড়াচ্ছে, হঠাৎ বড় মানুষটির চোখ পড়ল, তার পরিবারেরই এক সদস্যের কাঁধে একটা ব্যাগ,

—আরে একি, তুমি বইবে কেন, কুলিই যখন করা হয়েছে।

—আহা! ও বেচারা আর কত বইবে!

—আরে, ওরা তো ওই কাজের জন্যেই। একটা কাঁধ এখনো খালি। খালি যাবে কেন, তুলে দাও, তুলে দাও।

লোকটি আর মানুষ রইল না, হয়ে গেল সচল বোঝা। এইতেই শেষ হল না তার হেনস্তা। তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলা হল 'চোখে, চোখে রাখো। খুব সাবধান। মালপত্তর নিয়ে হাওয়া না হয়ে যায়।' 'এই তোমার নম্বর কত?'

লোকটি জাতে কুলি। নাম নেই নম্বর।

ইংরেজরা আমাদের মাথাটি খেয়ে গেছে। অভিজাত সম্প্রদায় মানে অসভ্য সম্প্রদায়। অনেক টাকা, অনেকে প্রচুর শিক্ষিত, কিন্তু তাদের ভেতরে আসল মানুষটা নেই।

অহংকারে চাপা পড়ে আছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে 'বেয়ারা' বলে যে যত বেয়াড়া চিৎকার করতে পারবে তার আভিজাত্যই সব চেয়ে বেশি। উর্দিপরা লোকটি সসম্ভ্রমে এগিয়ে দেবে মেনু। বেয়ারা আর বয় দুটি সমার্থক শব্দ। প্রবীণও বয়, নবীনও বয়। রেস্তোরাঁর টাই-আঁটা সুদর্শন ছেলেটি হল 'ওয়েটার'। খাতা, পেনসিল হাতে তটস্থ, 'কী নেবেন স্যার!'

ছোট্ট ওইটুকু জায়গার মধ্যেই কত জাতের মানুষ! খরিদ্দার, সে যেমনই হোক প্রভুর সমান। ব্যবসার পুরনো নীতি। যাওয়ার সময় মোটা টাকার টিপস, দয়া নয়, স্ট্যাটাস সিম্বল। তুমি আমাকে খাতির করবে। টাকার বিনিময়ে খাতির আদায়। খাতির আর শ্রদ্ধায় অনেক তফাৎ। খাতির আদায় করতে হয়, শ্রদ্ধা গড়িয়ে গড়িয়ে এক মানুষ থেকে আর এক মানুষে চলে যায়। শ্রদ্ধেয় হতে হলে চরিত্র চাই। প্রেম চাই। নোটের বাণ্ডিল দেখিয়ে আদায় করা যায় না।

এক বড়লোক রেগে গেলেই ভৃত্যকে কঁ্যাৎ করে লাথি মারত। ঘণ্টাখানেক পরে একটা অনুশোচনা হত, তখন গোলামটিকে ডেকে বলত, এই নে কুড়ি টাকা। মালিক দিন তিনেক লাথি মারেনি। ভৃত্য উসখুস করছে, শেষে বলেই ফেললে, হুজুর, আমার পেছনটা অনেক দিন উপোস করে আছে।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও পুরুষের প্রভুত্ব। সেখানে টাকা নয়, অহংকার। জরু আর গরু দুটোই যেন সম্পত্তি। বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যেই ভালোবাসা 'ভেপার'। তখন ক্রিকেট খেলা। সংসার ক্রিজে উইকেট সামলাচ্ছে রমণী. পুরুষ একের পর এক বাম্পার ছাড়ছে।

শিক্ষিত মানুষকে জিজ্ঞেস করলুম, কোন আক্কেলে টানা রিকশা চাপেন! একটা জিরজিরে লোক টানছে, বসে আছে এক মেদের মৈনাক।

খুব কায়দার উত্তর এল, 'আমরা না চাপলে ও খাবে কী!'

এই খেয়োখেয়ির পৃথিবীতে খাওয়ার জন্যেই যত কাণ্ড। একদল বেশি খেয়ে ফুলছে, আর একদল অনাহারে চুপসে যাচ্ছে। 'মার হাব্বা'!

চলছে এবং চলবে

কি হবে!

একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে, প্রায় সব মানুষই পাগল হয়ে গেছে। এই রকম একপেশে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আত্মহত্যা বাড়বে, অপরাধ বাড়বে। মানুষ হাসতে হাসতে খুন করবে, কাঁদতে কাঁদতে বিয়ে করবে। নিয়মানুবর্তিতা; শৃঙ্খলা, সুবিন্যাস বলে কিছুই থাকবে না মানুষের জীবনে। দেশে দেশে রক্তগঙ্গা বইবে। ক্রমশই, ক্রমশই মানুষ হয়ে যাবে বিপজ্জনক এক কথাবলা পশু।

যাকগে, সে যা হবার তা হবে। সেই কারণে আমি মাঝে মধ্যে জঙ্গলে পালাই। বেশ লাগে গাছপালা কীটপতঙ্গের জগৎ। প্রকৃতির নিয়ম যা ছিল তাই আছে। বিশাল বিশাল গাছ আকাশের দিকে আলোর খোঁজে উঠে গেছে ডালপালার বাহু মেলে। পাতায় পাতায় বাতাসের বার্তা। ভোরের ঘুম ভাঙাতে যত পাখির যত গান। কিছু পরেই অরুণদেবের কিরণরেখা পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসবে মহীরুহের উত্থানুভূমিতে। এঁকে যাবে অনন্ত আলোর আলপনা। চাপা আলোর উৎসবে বনভূমির থমথমে নীরবতায় শুরু হবে নির্জনতার নৃত্য। বড় ব্যস্ত এই বনভূমি। বহু ধরনের, বহু বর্ণের পিঁপড়ের অবিরাম ছোটাছুটি। মাছিই বা কত রকমের! মৌমাছির নিরলস অন্বেষণ। কোথায় ফুটেছে মধুক্ষরা ফুল মৌমাছি জানে। কত রকমের সরীসৃপ। গাছের চূড়ায় দাঁড় কাক। সে তো ডাক নয়, বনভূমি প্রকম্পিত করা অদ্ভুত এক টঙ্কার। অজস্র কাঠবেড়ালি। তাদের বিচিত্র ছোটাছুটি, খেলা না খাদ্যের সন্ধান, কে বলবে! পাতা ঝরার কাল! অবিরাম ঝরেই চলেছে শালের পাতা। জঙ্গলের যে জায়গাটায় রোদ নামতে পেরেছে সেখানে এক ঝাঁক ছাতারে পাখি মহা কলরোলে সভা বসিয়েছে। সেই আলোকিত দিক থেকে এইবার আসছে একদল মেয়ে। কাঁধে ঝুলছে বস্তা। শালপাতা আর শুকনো ডাল কুড়োবে সারাদিন। জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীদের মতো

এরাও জঙ্গলের। খাতির করে শহরের ভোগ সুখে নিয়ে গেলে স্বার্থ আর সঙ্কীর্ণতার পীড়নে মরে যাবে।

এই বনানীতে আমিই এক আজব মানুষ। সম্পূর্ণ বেমানান এক শহুরে প্রাণী। আমার এই জঙ্গল-প্রেম একটা আদিখ্যেতা। জঙ্গলের মানুষ আমার মতো এইভাবে জঙ্গল দেখে না। আমি একটা, জঙ্গল একটা এই ভাব তাদের মধ্যে নেই। জঙ্গলে মানুষে সেখানে একাকার। এক থেকে আর এক-কে পৃথক করা যায় না। জঙ্গল তাদের চোখে কবিতা নয়, জীবিকা।

বনবিভাগের কর্মচারী এসে প্রশ্ন করলেন, 'কলকাতা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এইবার সরে পড়ুন।'

কলকাত্তাই মেজাজে বললুম, 'কেন?'

'আপনার ভালর জন্যেই বললুম। টাস্কারের নাম শুনেছেন, দাঁতাল হাতি?'

'শুনেছি।'

'সেইটা তার দল নিয়ে ঘুরছে এই জঙ্গলে। কাল রাতেও অত্যাচার করে গেছে। হঠাৎ এসে গেলে কি করবেন?'

'ছুটব! ছুটে পালাব।'

'পারবেন না। হাতি দয়া না করলে পারবেন না।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল খুব। কলকাতারই ছেলে। কবিতাও লিখেছেন। তাঁরই বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে গল্প। বললেন, 'শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে রোমান্‌সেরও মৃত্যু হবে। আপনি দেখছেন গাছ এরা দেখছে কাঠ। আপনি দেখছেন ঝরা পাতা, এরা দেখছে শালপাতা। কীট, পতঙ্গ, পাখি, পূর্ণিমা এদের চোখে পড়ে না। আটচালায় বসে ভিডিও দেখে, বোম্বাই নাচ আর গান, খুনোখুনি, মারামারি। মানুষ আর মাথার দিকে নেই, পেটের দিকে নেমে এসেছে। শুনবেন আমার দুঃখের কথা, আমি জঙ্গলে থাকি বলে আমার বউ আমাকে ডিভোর্স করে চলে গেছে।'

বাংলোর বারান্দায় দুজনে হাঁ করে বসে রইলুম। তিনটে বাহারী প্রজাপতি উড়ছে।